জনক-জননী

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক—
শ্রীসত্যেন্দ্রলাল রায়
৮সি, বিডন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

জনক-জননীর ছবি—
রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

দক্ষিণেশ্বরের ছবি—
কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

মূল্য দুই টাকা

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬

ফাইন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত
৪৩।এ, নিমতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

গ্রন্থকারের নিবেদন

এই পুস্তকের নাম রাখিয়াছি 'জনক-জননী'। জনক, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও জননী, দেবী সারদামণি···এই পুস্তক হইল তাঁহাদের তুইজনের জীবন-কাহিনী।

লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন, হর-পার্বতীর মতন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর তাঁহার সহধর্মিণী আমাদের মনে জনক-জননীর অভিন্নরূপে বিরাজ করিতেছেন ; একজনের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলে, অপর জনের চরণে গিয়া তাহা পড়ে ; একজনকে স্মরণ করিলে, অপরজন ছায়ার মতন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হন···তাপিত তৃষ্ণার্ত মানুষের মনে অবিচ্ছেদ যুগল মূর্তিতে বিরাজ করিতেছেন, আমার জনক-জননী, আমাদের সকলের জনক-জননী। যে-কেহ তৃষ্ণার্ত, যে-কেহ আর্ত পীড়িত, যে-কেহ স্নেহভিক্ষু, জাতিধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য অনাদি স্নেহের স্পর্শ লইয়া নিত্য বিরাজ করিতেছেন জীব-পিতা আর জীব-জননী।

এই অবিশ্বাস-সংক্ষুব্ধ শতাব্দীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবির্ভাব বর্তমান বিশ্বের সর্বোত্তম ঘটনা। যদিও তিনি বাংলাদেশে বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব জীবন ও অপরূপ জীবন-সাধনার সহিত বিশ্বের জীবন-ধারারই সব চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ সংযোগ। আজ বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষবাদের আশ্বাসে আমরা যেভাবে জীবনের সমস্ত সমস্যাকে সমাধান করিতে ছুটিয়া চলিয়াছি, সেখানে আমরা প্রতিপদে দেখিতেছি, জীবনের এমন সব নিগূঢ় অন্ধকার গর্ত রহিয়াছে, যেখানে

বিজ্ঞানের আলোও প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। বিজ্ঞান যেখানে মূক, বিজ্ঞান যেখানে পঙ্গু, সেখান হইতেই যাত্রা সুরু করিয়াছে ভারত-সাধনা। এতদিন এই ভারত-সাধনার ধারা জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হইতে দূরে অবজ্ঞার প্রস্তর-স্তরে ঢাকা পড়িয়াছিল, ঠাকুর রামকৃষ্ণ আসিয়া প্রত্যক্ষ জীবনের ক্ষেত্রে সেই অমর ধারাকে আবার জীবন্ত করিয়া তুলিলেন। মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতির আলোয় জীবন আর জীবনাতীত আবার দিব্যমূর্তিতে প্রকট হইয়া উঠিল। ঠাকুর মানব-জীবনকে, মানব-কর্মকে, এই ইহকালের ক্ষণ-অস্তিত্বকে আবার মৃত্যুহীন অমরত্বে বিমণ্ডিত করিয়া দিয়া গেলেন। দিকভ্রান্ত পথিককে আবার তাহার পথের সন্ধান দিয়া গেলেন।

বিশ্ব-মানবের জীবন-ক্ষেত্রে তিনি যে কি সুমহান্ দান রাখিয়া গেলেন, তাহা আজও আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই আমরা স্পষ্টভাবে প্রমাণ পাইতেছি যে, আর্ত পীড়িত মানবতাকে নিজের মুক্তির সন্ধানে এই মহা-উৎসের নিকট আসিতেই হইবে। তাই আজ আমরা দেখিতেছি, বিজ্ঞানের সমস্ত আশ্বাসকে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া দিকভ্রান্ত য়ুরোপও এই মহা-মানবের জীবনের দিকেই ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

তাঁহার অপরূপ জীবনের মধ্যে তিনি প্রতিদিনের সংসারের অতিসাধারণ মানুষের জন্যই অমৃত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাই সর্বত্যাগী আজন্ম ব্রহ্মচারী স্বেচ্ছায় পত্নীরূপে

নারীকে পাশে স্থান দিয়াছিলেন এবং নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ সাধনার ভিতর দিয়া নর-নারীর সম্পর্ককে অনন্ত মাধুরী আর অবিনাশী পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে নর ও নারীর এই সম্পর্ক যে কতখানি সুগভীর, সুপবিত্র ও মহান্ তাহা তিনি নিজে আচরণ করিয়া দেখাইয়া দিয়া গেলেন। ঠাকুরাণীর সহিত তাঁহার দিব্য সম্পর্ক মানব-ইতিহাসের এক অনন্যসাধারণ মহাকাব্য। এই গ্রন্থে সেই সম্পর্কের মহিমাকেই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাই ইহার নাম দিয়াছি, 'জনক-জননী'।

তাঁহার পুণ্যনাম, তাঁহার পুণ্যস্মৃতি যেখানে উচ্চারিত হয়, সেখানেই জন্মগ্রহণ করে স্বর্গ। সেই স্বর্গের যদি ক্ষীণতম আভাসও কোন পাঠকের চিত্তে জাগিয়া উঠে, নিজেকে সার্থক মনে করিব।

পরিশেষে এই পুস্তক রচনা সম্পর্কে আর একটী কথা নিবেদন করিতেছি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আমার এই রচনার পশ্চাতে যাঁহার প্রেরণা ও উৎসাহ বিজড়িত আছে, বিশেষ এক কারণে এই গ্রন্থ প্রকাশের সহিত তিনিই ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। তিনি হইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ, পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দের প্রিয় ভক্ত, সোদরতুল্য বন্ধু সত্যেন্দ্রলাল রায়। তাঁহারই উৎসাহ ও আগ্রহে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

বিশেষ এক কারণে এই গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে হইল। ইহা শুধু গ্রন্থকারের কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নয়। ইহার সহিত আমাদের উভয়ের জীবনের এক বেদনার স্মৃতি সুতীব্রভাবে বিজড়িত। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে সেই বেদনাকে নৈবেদ্যের মত রাখিতে পারিলে বেদনাদগ্ধ হৃদয় কথঞ্চিৎ শান্তি পাইতে পারে, এই কারণে এবং বন্ধুবরের পরলোকগত শিশু-সন্তানের কল্যাণ ও তৃপ্তির কামনায় এই ভূমিকা ও তৎসংলগ্ন উৎসর্গ-পত্র রচিত হইল।

এই পুস্তক যখন লিখিত হইতেছিল তখন সত্যেন্দ্রলালের শিশুপুত্র সহসা কাল-ব্যাধিতে পরলোক গমন করিল। প্রতিদিন রাত্রিতে যখন সত্যেন্দ্রলাল ঠাকুর রামকৃষ্ণের পূজা করিতেন, তখন এই শিশু নিঃশব্দে তাঁহার পাশে থাকিয়া ঠাকুরকে তাহার বাণীহীন শিশু-অন্তরের নিষ্কলুষ অর্ঘ্য নিবেদন করিত। আজ সেই শিশু ইহলোক হইতে ভাসিয়া মৃত্যুর পরপারে ঠাকুরের শ্রীচরণে গিয়া পৌঁছিয়াছে। তাই এই গ্রন্থের সহিত তাহার স্মৃতিকে বিজড়িত করিয়া বন্ধুর অন্তরের সেই মহাবেদনার অংশ গ্রহণ কবিতে চাই। সেইজন্যই এই পুস্তক তাহারই নামে, তাহার স্নেহার্ত পিতার পক্ষ হইতে উৎসর্গীকৃত হইল।

একদিন যেমন ঠাকুরের পূজার সময় সে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিত, তেমনি আজও আড়ালে থাকিয়া আমাদের প্রত্যেক প্রণামের সহিত সেও প্রণাম করিতেছে।

গ্রন্থকার

বাবুল !

প্রতিদিন যাঁর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে
তুমি প্রণাম করতে,
তাঁর জীবনের পুণ্যকথার সঙ্গে তোমার
নাম জড়িয়ে দিলাম,
তাঁর চরণে রইল তোমার স্মৃতি, অম্লান
ফুলের মতন,
জানি, তাতেই তুমি পাবে পরমতৃপ্তি ।

বাবা

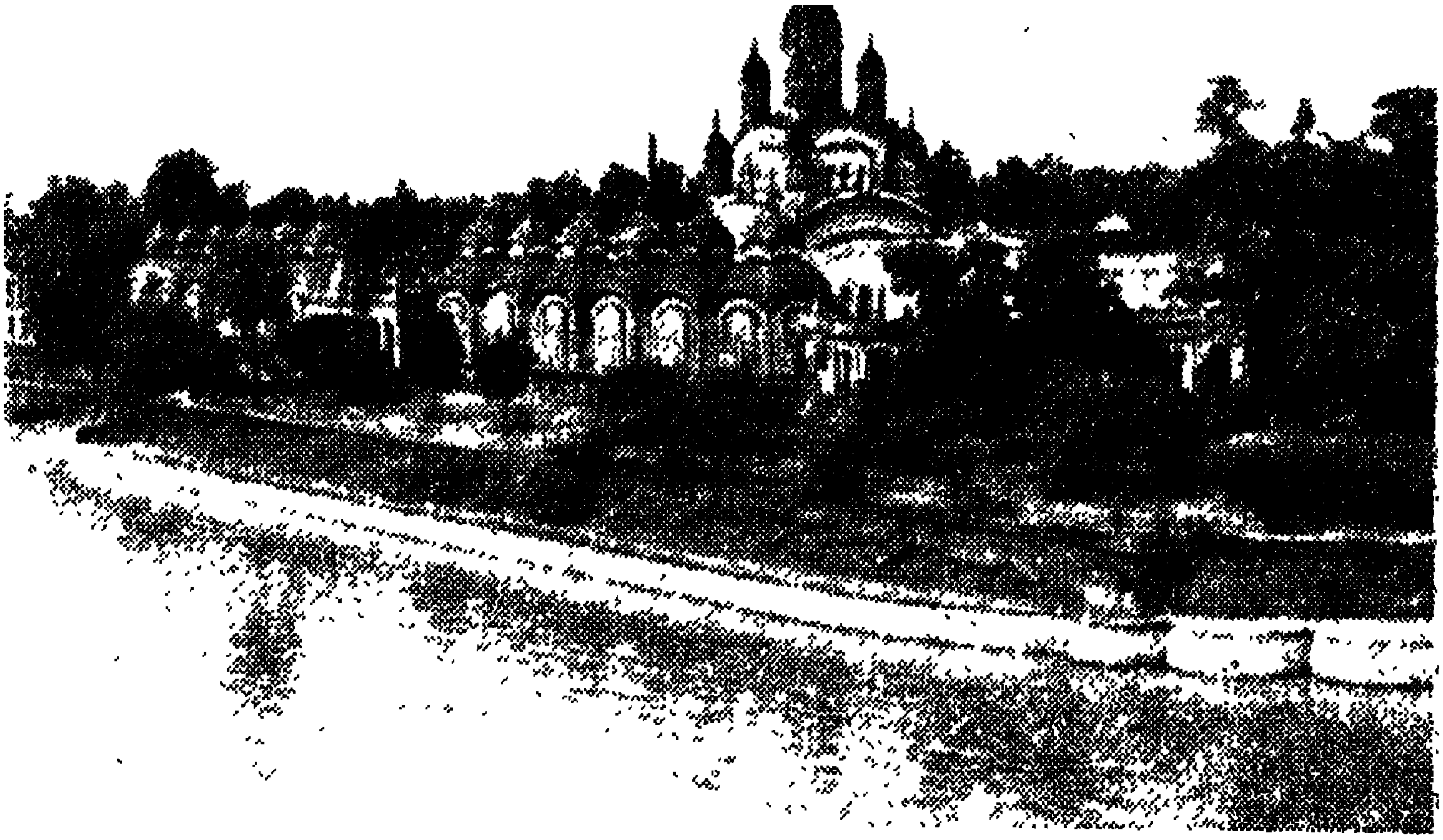

ভূমিকা

মাতৃ-পূজার এই মহালগ্নে, তোমার লীলা-পীঠ এই বঙ্গভূমিতে, আজ বারবার তোমাকেই স্মরণ করি, হে চিরশিশু, এই পূজার প্রাণ-হীন আড়ম্বরের মধ্যে, স্মরণ করি তোমার আয়োজন-হীন প্রাণের পরম-তৃষ্ণাকে···স্মরণ করি, এই অন্তরহীন বাহির-সর্বস্বতার যুগে তোমার অমলিন আত্মিক তপস্যাকে···

তোমার একটী জীবনের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে তুমি এই ভারতের সহস্র যুগের জীবনের সহস্র বিভিন্ন ধারা উপলব্ধি করিয়া গিয়াছ···সহস্র যুগের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের সমুদ্র-তল থেকে, ক্ষীরোদসিন্ধু মন্থনের দিনে সমুত্থিত অমৃত-ভাণ্ডের মত, তোমার জীবন-অমৃত, নিজেই মন্থন করিয়া আমাদের দিয়া গিয়াছ···দিয়া গিয়াছ, সন্দেহবাদী বিশ্বের সম্মুখে শাশ্বত ভারতের দিব্য মূর্তিকে সমুদ্ভাসিত করিয়া···

ক্ষত-বিক্ষত আর্ত বিশ্ব আজ তস্করের মত, নিজের অঙ্গ-ক্ষত সযত্ন-বর্ধিত স্বার্থবুদ্ধির আবরণে ঢাকিয়া, অন্তরের রিক্ততা বাহিরের লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্যে পরিপূরণ করিবে বলিয়া যে আত্মঘাতী পথে তীব্র বেগে চলিয়াছে, তাহারই পথ-প্রান্তে দাঁড়াইয়া, হে মহা-ঐশ্বর্য্যশালী প্রাণ-ভিক্ষু, স্মরণ করি, প্রাণের শঙ্খে নিঃশঙ্ক তোমার আহ্বান···স্মরণ করি হে একক যাত্রি, আত্মার আলোক-পথে তোমার সুমহান্ সেই মহাপ্রত্যাবর্তন···

বিজ্ঞান যাহা প্রমাণ করিতে পারে নাই বলিয়া মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল, তোমার জীবনে, জীবনের সেই চরমতম সত্যকে তুমি অঙ্কশাস্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রমাণে সত্য-রূপ দিয়া গিয়াছ···ধর্ম্মকে জীবনের সহিত যুক্ত করিয়া তাহার নূতন সংজ্ঞা দিয়াছ···আত্মার নিগূঢ় লোকে যা ছিল বাষ্প, যা ছিল কাহিনী, কল্প-কথা, মানব-চেতনার প্রত্যক্ষ-অনুভূতির মধ্যে তুমি তাহাদের লইয়া আসিয়াছ···একটী স্পর্শ···একটি দৃষ্টি···তাহাতে গড়িয়াছ বিশ্ব···ভাঙ্গিয়াছ বিশ্ব···

তাই আজ সব-পাওয়ার মরুভূমিতে দাঁড়াইয়া কাতরভাবে হে সর্ব-রিক্ত মহৈশ্বর্য্যবান্ তোমার দিকেই বার বার চাহিতেছি ···তোমার মন্দিরে আসিতে পথ ভুলিয়া যে-অরণ্যে পথ-হারা ঘুরিতেছি, তোমারই কৃপায় যেন দিনান্তে খুঁজিয়া পাই সে-পথ···

জনক-জননী

১

রামানন্দ রায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা দেশের এক নগণ্য জমিদার · আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় · তাঁরই একজন দরিদ্র প্রজা ধর্মভীরু সত্যনিষ্ঠ···

বিশেষ প্রয়োজনে · তিনি ক্ষুদিরামকে ডেকে পাঠিয়েছেন···

আদালতে একজন বিশ্বস্ত সাক্ষীর প্রয়োজন, যার মুখের কথা আদালত সত্য বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। সে-অঞ্চলে ক্ষুদিরামের সে খ্যাতি আছে তাই তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে, জমিদারের স্বপক্ষে আদালতে সাক্ষ্য দেবার জন্যে!

এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। ক্ষুদিরাম আনন্দে স্বীকার করলেন, তিনি সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত কিন্তু কার বিরুদ্ধে? আর কি-ই বা সাক্ষ্য দিতে হবে?

—মামলা তাঁরই এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে, জমিদার চান তাঁকে একটু জব্দ করতে। তাই ক্ষুদিরামকে জমিদারের স্বপক্ষে দু'একটা মিথ্যা বলতে হবে!

ব্রাহ্মণ শিউরে উঠলেন। এ তাঁর দ্বারা কখনো সম্ভব হতে পারে না। জমিদারের অনুনয়, আদেশ, কোন কিছুর জন্যেই নয়।

জমিদারকে ক্ষুণ্ণ করে ক্ষুদিরাম চলে আসছেন, এমন সময় নায়েব কানে কানে শুনিয়ে দিল, ভাল করলেন না আর একবার ভেবে দেখুন···জানেন তো হুজুরকে।

—আমার দিক থেকে এ বিষয়ে ভাববার আর কিছু নেই।

বাড়ী ফিরে এসে রঘুবীরের বিগ্রহের সামনে করজোড়ে ব্রাহ্মণ বল্লেন, রঘুবীর, সত্যরক্ষার জন্যে তুমি না করেছ কি? আমি তোমার দীন সেবক···রক্ষা কোরো আমায়।

রঘুবীর মিথ্যার বিরুদ্ধে তাঁকে রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু জমিদার রামানন্দ রায় তাঁর জমি-জমা, ভদ্রাসন সমস্ত কৌশলে নিলেন দখল করে।

রঘুবীরকে মাথায় করে নিয়ে ব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে একেবারে পথে এসে দাঁড়ালেন।

সাধ্বী স্ত্রী চন্দ্রা দেবী বল্লেন, এ গাঁয়ে আর থাকবো না· জমিদার যদি এতেও শান্ত না হয়?

গাঁ ছেড়ে, পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে, ব্রাহ্মণ হাটতে আরম্ভ করলেন সঙ্গে চল্লেন রঘুবীর

২

ক্রোশ খানেক দূরে, কামারপুকুর গ্রাম··সেই গাঁয়ের সুখলাল গোস্বামীর সঙ্গে ক্ষুদিরামের বন্ধুত্ব বন্ধুর বিপদের কথা শুনে গোস্বামী তাঁকে তাঁর বাড়ীর একধারে আশ্রয় দিলেন।

বাড়ীর সঙ্গে কয়েকখানা চালা ঘর। সেই ঘরগুলি তিনি বন্ধুকে দান করলেন।

ক্ষুদিরামের মনে বড় ভাবনা ছিল, বুঝি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রঘুবীরকে নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। নিজের বা স্ত্রী-পুত্রের অনাহার সওয়া যায় কিন্তু রঘুবীর···বন্ধ হবে তাঁর নিত্য সেবা ?

দশ বছরের ছেলে রামকুমার ও কন্যা কাত্যায়ণীকে নিয়ে সস্ত্রীক ক্ষুদিরাম মহানন্দে সেইখানেই নতুন করে রঘুবীরকে প্রতিষ্ঠা করলেন।

সুখলাল গোস্বামী বন্ধুকে সেই সঙ্গে এক বিঘা দশ ছটাক ধেনো জমি দান করলেন···মাত্র এক বিঘা দশ ছটাক···কিন্তু যখন সেই সামান্য জমিতে ফসল হলো, দেখা গেল, এত ধান হয়েছে যে তাতে তাঁদের সারা বছর চলে গিয়েও, উদ্‌বৃত্ত থাকবে···

ক্ষুদিরাম তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে দেব-দ্বিজ আর অতিথি-সেবায় ভুলে গেলেন, কে কবে করেছিল অত্যাচার !

৩

বাড়ীর গা ঘেঁসে চলে গিয়েছে পথ, তীর্থে যাবার পথ···তীর্থ যাবার পথে, সেইখান দিয়ে কত সন্ন্যাসী, কত পুণ্যলোভাতুর যাত্রী নিত্য যাতায়াত করে···কখন কখন অতিথিরূপে তাঁরা সেই ব্রাহ্মণ-বাড়ীর আতিথ্য গ্রহণ করে পথশ্রম লাঘব করেন···ক্ষুদিরাম আর চন্দ্রা দেবী পরম আদরে তাঁদের সেবা করেন···

বিশ্রামান্তে তাঁরা চলে যান……তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় ক্ষুদিরামের মন…পথের শেষে যেখানে আছে তীর্থ-দেবতা। কিন্তু রঘুবীর আর সংসার তাঁকে রাখে আটক করে…

বর্ষ যায়…যৌবন যায়…প্রৌঢ়ত্বও শেষ হয়ে আসে…ক্ষুদিরামের বয়স ক্রমশঃ হলো ষাট…

তিনি স্থির করলেন, আর বিলম্ব নয়…বহুদিন থেকে তাঁর অন্তরের সাধ, মধুমাসে গয়াধামে গদাধরের পাদ-পদ্মে তিনি পিতৃ-পুরুষদের তর্পণদানে তৃপ্ত করবেন…

রামকুমার আর রামেশ্বর, দুই পুত্রের ওপর সংসার আর রঘুবীরের ভার দিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন…পায়ে হেঁটে গয়াতীর্থে…

সেখানে গদাধরের পাদ-পদ্মে যথাশাস্ত্র পিতৃ-পুরুষদেব তর্পণ করে পিতৃ-ঋণ থেকে মুক্ত হলেন…আনন্দে তাঁর চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠলো…

রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখেন, গদাধরের সামনে তিনি পুনরায় তর্পণ কার্য কবছেন…সহসা সমস্ত মন্দির আলোয় আলো হয়ে উঠলো…দেখেন, সারি সারি সব জ্যোতির্ময় পুরুষ…দিব্য দেহধারী…পিতৃ-পুরুষগণ…দুই কর প্রসারিত করে তাঁরা তাঁর অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন…অর্ঘ্য-অন্তে পিতৃ-পুরুষগণ মণ্ডলাকারে দাঁড়িয়ে কাকে যেন স্তব করতে আরম্ভ করলেন…বিস্মিত, পুলকিত ক্ষুদিরাম অগ্রসর হয়ে দেখেন মণ্ডল-মধ্যস্থ জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁরি ইষ্টদেবতা…নবজলধর-শ্যাম মূর্তি…কি যেন বলবার জন্যে সমগ্র চেতনা চঞ্চল হয়ে উঠলো…কিন্তু তার আগেই দেখেন, সেই মণ্ডল-মধ্যস্থ দিব্যদেহ তাঁর দিকেই অগ্রসর

হচ্ছেন…যেন তাঁকেই উদ্দেশ্য করে বলছেন, আমি তোমার সঙ্গে তোমার গৃহেই যাব।

নিদ্রা ভেঙ্গে যায়…জ্যোতি-আহত স্বপ্নাতুর চোখে তিনি কেঁদে ওঠেন…বলেন, অসীম করুণা তোমার…কিন্তু এ দরিদ্রের ঘরে কোথায় হবে তোমার স্থান ? সে-ধূলোয় কি করে রাখবে তোমার চরণ-কমল ?

৪

কামারপুকুরে সেই সময় গহন রাত্রিতে স্বামীশূন্য একা-ঘরে চন্দ্রা দেবী সহসা শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লেন…তাঁর মনে হলো, নিদ্রাকালে তাঁর পাশেই জ্যোতির্ময় কোন পুরুষ কে যেন শুয়ে ছিলেন…স্বামী মনে করে তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করতে গিয়ে দেখেন, সাধারণ মানুষের অঙ্গ তো সে নয়! আতঙ্কে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল…তাড়াতাড়ি শয্যা ছেড়ে উঠতে গিয়ে তাঁর মনে হলো, সেই দিব্যরূপ তেমনি তো শয্যায় শুয়ে রয়েছে, তবে…এতো স্বপ্ন নয় ? ভয়-ব্যাকুলচিত্তে তিনি ঘরের অর্গলের কাছে গিয়ে দেখেন, অর্গল তেমনি বন্ধ রয়েছে…তাড়াতাড়ি অর্গল খুলে সেই অন্ধকারে তিনি প্রতিবেশিনী ধনী কামারাণীকে ডেকে তুল্লেন ধনীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে এসে প্রদীপ জ্বেলে দেখেন শয্যা শূন্য…

ক্ষুদিরাম তীর্থ থেকে ফিরে এসে যখন সেই ব্যাপার শুনলেন, তার সর্ব-দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো…

…সেই বৃদ্ধ বয়সে চন্দ্রা দেবী পুনরায় সন্তান-সম্ভবা হলেন।

রাত্রিতে সহসা চন্দ্রার ঘুম ভেঙ্গে যায়…এই যেন শুনলেন, ঘরে কোন্ শিশু গোপের পায়ে নুপূর-শিঞ্জন-ধ্বনি…কারা যেন শূন্যে শূন্যে

কি কথা বলে যায়…স্বপ্নে তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন · জাগরণে আবছা মনে পড়ে…

ক্ষুদিরাম আশঙ্কিত অন্তরে দিন গুণে চলেন।

৫

একপাশে ছোট্ট খড়ো চালা ঘর, তার এক দিকে ধান কোটবার ঢেঁকি… আর একদিকে ধান সিদ্ধ করবার উনুন · তারি মাঝে একটুখানি জায়গায় ধনী কামারণী প্রসূতিকে নিয়ে ব্যস্ত

শুক্ল আকাশে তখন রাত্রি এক চল্লিশ দণ্ড অতীত হয়ে অর্ধদণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে, তিথি দ্বিতীয়া ধীরে পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে শুভ সিদ্ধিযোগের প্রবর্তন করতে চলেছে রবি, চন্দ্র আর বুধ একই লগ্নে মিলিত হয়েছে

এমন সময় ঢেঁকি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ধনী আনন্দে বলে উঠলো, ওগো শাঁখ বাজাও।

ক্ষুদিরাম বুঝলেন, পুত্র সন্তান তবে কি গদাধর, স্বপ্নকে সার্থক করবার জন্যে দরিদ্রের জীর্ণ-কুটীরে তুমি এলে?

ধনী আঁতুড় ঘরে ঢুকে দেখে, ওমা —ছেলে কোথায়? প্রসূতির পাশে যে রেখে সে এইমাত্র বাইরে গিয়েছিল? খুঁজে দেখে, উনুনের মুখে ছাই-গাদার ওপর ছেলে শুয়ে আছে ··সর্ব অঙ্গ ছাই-এ শাদা হয়ে গিয়েছে·· শিশু-শিব…

গয়া-তীর্থের কথা স্মরণ করেঃক্ষুদিরাম নব-জাতকের নাম রাখলেন, গদাধর···

৬

গদাধর পাঠশালায় যায়···কিন্তু নামতার নাম শুনলেই শুকিয়ে যায়···কিছুতেই মুখস্থ হয় না···কিন্তু লাহাদের বাড়ীতে কথক-ঠাকুর কবে রাম-সীতার কাহিনী গেয়েছিলেন···বালক একবার শুনেছিল মাত্র ···ঠিক তেমনি অঙ্গভঙ্গী করে অবিকল বলে যেতে পারে···যাত্রায় কবে রাধা কেঁদেছিল শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়েছিলেন বলে, বালক অবিকল রাধার মতন করে কাঁদে, হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, বলতে তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে···রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ বালক যা শুনে, তা অবিকল স্মরণে রাখে···

কুমোর পাড়ায় পাল-পার্বণে কুমোর খুড়ো কত দেব-দেবীর মূর্তি গড়ে, বালক তন্ময় হয়ে দেখে·· বাড়ীতে এসে কাদার তাল নিয়ে নিজের মনে ছোট ছোট সেই সব মূর্তি অবিকল গড়ে তোলে···যেখানে যেটী দরকার, কার পায়ে পদ্ম, কার হাতে শাঁখ, কার মাথায় চূড়ো···নিখুঁত ···যেখানে যেটী দরকার···

আম বাগানে বিকাল-বেলা গদাধর সঙ্গীদের নিয়ে খেলা করে··· যাত্রায় যেমন দেখেছে, তেমনি কেউ হয় রাধা, কেউ হয় সখী, কেউ হয় কৃষ্ণ···গদাধর একাই সকলের কথা বলে চলে···আড়াল থেকে গ্রাম-নারীরা শুনে বিমুগ্ধ হয়ে যায়···

সবাই আদর করে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যায়•••বালক আবৃত্তি করে শোনায়···

একদিন খালের ধারে বালক আপনার মনে একা খেলা করছে··· এমন সময় সহসা আকাশে সমারোহ ক'রে এলো মেঘ···যেমন মেঘ শুধু বর্ষায় বাংলার আকাশে দেয় দেখা···কালো কাজল মেঘ·· গদাধর এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেই কাজল-কালো মেঘের দিকে···এমন সময় তার বুক চিরে উড়ে চলে গেল শঙ্খ-ধবল বকের পাঁতি···কালোর বুকে অথির আলো···বালকের কি মনে হলো, বালকই জানে, দেখতে দেখতে তার বাহ্যজ্ঞান গেল হারিয়ে···সেইখানে সেই মাঠের ওপর বালক জ্ঞানশূন্য মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো···

সেই পথ দিয়ে যেতে গ্রামবাসীরা দেখে বালক মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে···বহু চেষ্টায় বালকের জ্ঞান ফিরিয়ে এনে তারা বালককে বাড়ী নিয়ে এলো•••

চন্দ্রা দেবী যত ঠাকুর ছিল সকলের কাছে মানত করেন, এ রোগ বাছার কেন দিলে তোমরা ?

৭

রোগ ঘন ঘন দেখা দিতে লাগলো···ঠাকুর দেবতার কথা বলতে বলতে, কখন মেঘের দিকে চেয়ে, কখন ফুলন্ত গাছের দিকে চেয়ে, কখন বা আরতির শব্দ শুনে, বালকের কি হয় কে জানে, জ্ঞানহারা হয়ে বালক লুটিয়ে পড়ে, কখনও বা নীরবে দু'চোখ দিয়ে তার জল ঝরে•••যেন চোখের পাতার আড়ালেই আছে জলের ঝারি···

কেউ বলে মূর্চ্ছা রোগ !

কেউ বলে, ক্ষুদিরাম, তুমি ভাগ্যবান্, এ যে সব অবতারের লক্ষণ··· দেবতা যখন মানুষ হয়ে আসে, তখন দেখনি, তার শৈশব-লীলা ?

মা ভাবেন, অপদেবতার কাণ্ড। মনে মনে মানত মানেন তেত্রিশ কোটী দেবতার।

৮

কিন্তু তা বলে বালক খুব শান্ত ছেলে ছিল না। পুকুরঘাটে পল্লী-রমণীরা স্নান সেরে জলেই পূজো-আহ্নিক করছেন, এমন সময় কোথা থেকে গদাধর দলবল নিয়ে সেখানে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার স্বরু করে দিল···তাদের ছিটকানো জল পূজার্থিনীদের মুখে গায়ে লেগে তাঁদের বিরক্ত করে তোলে···

একদিন এক বর্ষীয়সী ছেলেদের ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, হাঁরে, কেমন ছেলে তোরা ! মেয়েরা এই ঘাটে আদুল গায়ে নায়—এ ঘাটে তোরা আসিস্ কেন ?

গদাধর ধমকানির তাৎপর্য বুঝতে না পেরে বলে উঠলো, তাতে হয়েছে কি ?

—আদুল গায়ে মেয়েদের দেখতে নেই ! গদাধর কিছুতেই কথাটা বিশ্বাস করতে পারলো না। কি মহা-ক্ষতি হবে তাতে ?

কাউকে কিছু না বলে, বালক ঠিক করলো, স্নানের সময় গাছের আড়াল থেকে রোজ সে দেখবে···কি ক্ষতি হয় সে নিজে দেখবে !

পাঁচ-ছদিন ঐভাবে দেখার পর বালক যখন দেখলো, জগতে সেই ব্যাপারের জন্যে কোথাও কিছু ঘটলো না, তখন একদিন পুকুরঘাটে সেই বর্ষীয়সীর মুখের সামনে গিয়ে বল্লো, কইগো, আমি তো রোজ দেখি, কই কি ক্ষতি হলো ?

রমণী বালকের কথা শুনে হেসে তার জননীকে জানালেন। জননী নিভৃতে বালককে বোঝালেন, তাতে তোমার কোন ক্ষতি হয় না, সেটা ঠিক বটে কিন্তু মেয়েরা তাতে অপমানিত হয়।

বালক আর কোন প্রতিবাদ না করে মার কথাই স্বীকার করে নিল। আর কোনদিন পুকুরঘাটে বালককে দেখা গেল না।

৯

যথাকালে বালকের উপনয়ন-সংস্কার হলো। যজ্ঞ হয়ে যাবার পর নতুন ব্রহ্মচারী ভিক্ষুকের বেশে সকলের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে।

নতুন ব্রহ্মচারীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ধাই-মা ধনী কামারাণী অনেকদিন থেকে তাঁকে বলে রেখেছিল, তোর পৈতের সময় আমার বড় সাধ প্রথম ভিক্ষে আমি দেব। বালক কথা দিয়েছিল, তা আর কি ! বালক তখন জানতো না যে, তা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। ধনী তার ধাই-মা হলেও, সে শূদ্রাণী। শূদ্রাণীর হাত থেকে প্রথম ভিক্ষা নেওয়া, এমন কি তার হাত থেকে ভিক্ষা নেওয়াও, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

ভিক্ষা নেবার সময় বালকের সেই প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ে গেল। যে কেউ ভিক্ষা দিতে আসে, নতুন ব্রহ্মচারী তা গ্রহণ করেন না। ধনী আগে না দিলে, আমি ভিক্ষাই নেবো না।

পুরোহিত বোঝায়, বাড়ীশুদ্ধ সবাই বোঝায়, কিন্তু নতুন ব্রহ্মচারী বোঝে না। শূদ্রাণী কি মানুষ নয়?

কোন অনুনয়-বিনয়ে যখন কোন ফল হলো না, তখন বাধ্য হয়েই ধনী কামারাণীকে ডাকা হলো। ধনী ভিক্ষার মুঠি বাড়ালো···নতুন ব্রহ্মচারী আনন্দে বলে উঠলো, ভবতি ভিক্ষাম্ দেহি!

১০

ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে সংসারের ভার রামকুমারের ওপর এসে পড়লো··· সেই সঙ্গে রঘুবীরের নিত্য-পূজার ভার পড়লো গদাধরের ওপর···

এতদিন পরে গদাধর যেন একটা কাজ পেলেন···সারাদিন মন পড়ে থাকে ছোট্ট ঠাকুর ঘরটীর আশে-পাশে···পূজো করেন, যেন ঠাকুর জীবন্ত তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন···

এমনি ভাবে একদিন এলো শিব-রাত্রি। সারাদিন উপোস করে গদাধর ঠিক করলেন, সারা রাত জেগে তিনি শিব-নাম জপ করবেন···

দিনের কাজ শেষ করে উপবাসী ব্রাহ্মণ শিব-পূজার জন্যে বসলেন··· এমন সময় তাঁর এক বন্ধু এসে তাঁর হাত ধরে বল্লো, এখনি এসো, বড় দরকার।

—কোথায়?

—পাইন্ মশাইদের বাড়ী···সেখানে সারা রাত শিব-ঠাকুরের যাত্রা হবার কথা কিন্তু যে লোকটী শিব সাজতো, হঠাৎ তার কঠিন অসুখ

হয়েছে··সবাই বল্লে, তোমাকে শিবের পার্ট করতে হবে···একমাত্র তুমিই পারবে···তোমার তো সব মুখস্থ আছে···

অন্য সময় হলে গদাধরের আপত্তি ছিল না···কিন্তু শিব-পূজোর জন্যে মনস্থ হয়ে তিনি বসেছেন, এখন কি করে হয়?

বন্ধু বুঝিয়ে বলে, শিবের অভিনয়ের মধ্যেই শিব-পূজো হয়ে যাবে।

সেই বিশ্বাসে গদাধর যাত্রায় শিব সাজতে চল্লেন···

সাজঘরে যথারীতি তাঁকে শিব সাজানো হলো···বিভূতি-ভূষিত-অঙ্গ···গলায় রুদ্রাক্ষ মালা··মাথায় বাঁধা জটা···জটায় লম্বমান বিষধর···

ক্রমশ গদাধরের সব-অঙ্গ নিথর হয়ে আসছিল···ক্ষণকাল পরে যখন আসরে গিয়ে অবতীর্ণ হলেন, তখন আর তাঁর মুখে কথা নেই···দেহে সাড় নেই···নিশ্চল নিথর দেহ···সেইখানেই অবসন্ন হয়ে পড়ে গেল··

চেতনার কোন চিহ্ন নেই···যেন প্রাণহীন দেহ···প্রাণহীনই সবাই প্রথমে মনে করেছিল···কিন্তু প্রাণের লক্ষণ স্বরূপ দেখা গেল, শুধু দুচোখ দিয়ে নীরবে ধারা বয়ে চলেছে···

পরের দিন ভোর বেলা পর্যন্ত ঠিক সেই ভাবে রইলেন···

রাত্রি অবসানে সূর্য উঠলে, চেতনা ফিরে এলো আবার···

১১

রামকুমার ক্রমশ বৃদ্ধ হয়ে আসছিলেন···একে একে তাঁর উপার্জনও কমে আসতে লাগলো···তার ওপর স্ত্রী-বিয়োগে তিনি একান্ত কাতর হয়ে পড়লেন···সংসারে নিদারুণ অভাব দেখা দিল···

ঋণ করে সংসার চলে···কিন্তু তাতে কতদিনই বা চলে ?

রামেশ্বরের উপার্জন অতি সামান্য···গদাধর সে-সম্বন্ধে নিস্পৃহ···

অগত্যা রামকুমার গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন, ঝামাপুকুরে একটা টোল খুলে বসলেন···

একা, টোলের কাজ···খাওয়া-দাওয়া, বাজার করা ··বড়ই অসুবিধা হতে লাগলো···তাই তিনি কামারপুকুর থেকে নিষ্কর্মা গদাধরকে মানুষ করবার জন্যে নিজের কাছে কলকাতায় নিয়ে এলেন···

কিন্তু কলকাতায় এসে গদাধরের কোন পরিবর্তন দেখা গেলো না ··রামকুমার লেখাপড়া শেখাবার জন্যে কত চেষ্টা করেন·· কিন্তু লেখাপড়ায় গদাধরের কিছুতেই মন বসে না···

একদিন রেগে গিয়ে রামকুমার বলে উঠলেন, লেখাপড়া না শিখলে খাবে কি ?

তার উত্তরে গদাধর বল্লেন, খাবার জন্যেই যদি লেখাপড়া হয়··· সে-লেখাপড়ায় আমার দরকার নেই···আমার মনের জ্বালা জুড়োতে পারে এমন লেখাপড়া আমাকে শেখাতে পারো ?

সেই অজ্ঞ গ্রাম্য কিশোরের মুখে সেই কথা শুনে রামকুমার কি উত্তর দেবেন বুঝতে পারলেন না। তাঁর মনে হলো, লেখাপড়ায় ফাঁকি দেবার জন্যে পাগলের এই নতুন পাগলামি ! নইলে তার আবার মনের জ্বালা কি ?

সে-খবর তখন কেই বা জানতো? কেই বা বিশ্বাস করতো যে সেই পাঠশালা-পালানো ছেলেটির মনে, বিশ্বের চরম সমস্যা তখন নীহারিকা-রূপে বাষ্প-জ্বালা উদ্গীরণ করছিল?

বহু চেষ্টা, বহু অনুনয়-বিনয় করে রামকুমার যখন দেখলেন, পাগলকে কোন কাজেই লাগানো গেলো না, তখন হতাশ হয়ে তিনি সে-চেষ্টাই ছেড়ে দিলেন।

পাগল আপনার মনে ঘুরে বেড়ায়…কি যে মনে হাহাকার করে বুঝতে পারে না…কে যেন টানে, কে যেন ডাকে…কিন্তু কে সে? কেনই বা ডাকে তাকে? কেন তার মনে এ জ্বালা? লোকে যা নিয়ে সুখে হেসে খেলে থাকে, কেন তার কিছুই লাগে না ভালো?

১২

গঙ্গার বুকে সারি সারি একশোখানা নৌকো…কোন নৌকোতে চাল, কোন নৌকোতে তরীতরকারী…কোন নৌকোতে কাপড়-চোপড়… কোনটা রান্নাঘর করে সাজানো হয়েছে…কোনটা শোবার ঘর · এই ভাবে একশোখানা নৌকো তৈরী…

এখনি তারা যাত্রা করবে, গঙ্গার জলপথ দিয়ে কাশী-তীর্থে।

তীরে লোকে লোকারণ্য…কি ব্যাপার? রাণী রাসমণি চলেছেন, তীর্থ করতে, কাশীতে…

এমন সময় রাণীর বাড়ী থেকে পেয়াদা এসে খবর দিল, যাত্রা বন্ধ, রাণীমা যাবেন না!

বহুদিন থেকে রাণীর অন্তরে বাসনা ছিল, সংসারের কাজের ভার নামিয়ে কাশীতে গিয়ে বিশ্বনাথের সঙ্গে বিশ্বমাতার আরাধনা করবেন।

কিন্তু বিরাট জমিদারীর কাজে ছুটি আর তিনি পান না। তাঁর অন্তরের আকুলতা দেখে, তাঁর জামাই মথুরবাবু রাজী হলেন, জমিদারীর ভার নিতে। রাণীর মন থেকে যেন বোঝা নেমে গেল। নৌকো তৈরী করবার হুকুম দিলেন।

কিন্তু যাবার আগের দিন রাত্রিতে সহসা স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ইষ্টদেবী ছোট বালিকার মূর্তিতে এসে তাঁকে যেন আদেশ করছেন, কাশী যেতে হবে না...তাকে গঙ্গার ধারে মন্দির করে সেখানে আমাকে প্রতিষ্ঠা কর নিত্য পাবি আমার দেখা।

ভক্তিমতী নারীর অন্তর ভরে গেল সে-স্বপ্ন-বাণীতে। সব কাজ ফেলে তিনি স্থির করলেন, যেমন করে হোক গঙ্গার তীরে দেবীর মন্দির গড়ে তুলবেন সেখানে প্রতিষ্ঠা করবেন, মাতৃ-রূপা দেবী কালিকা আর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি! আবাল্য তার অন্তরের সাধ, অন্ন-ভোগ দিয়ে দেবীকে করবেন তৃপ্ত ...তাঁর প্রসাদ থেকে নিত্য প্রতিপালিত হবে দীনদুঃখী আতুরজন।

১৩

বহু অনুসন্ধানের পর গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে একটা পরিত্যক্ত শ্মশান-ভূমির কাছে কিছু জমি পাওয়া গেল। সেইখানে দেখতে দেখতে উঠলো দ্বাদশ মন্দির। সামনে বিরাট চত্বর...চত্বরের

মাঝামাঝি আর দুটী বড় মন্দির···একটা রাধাকৃষ্ণের, আর একটি জননী ভব-তারিণীর।

পাজি-পুঁথি দেখে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার দিন স্থির হয়ে গেল···১৮৫৫ সালের ৩১শে মে···স্নানযাত্রার দিন···

রাণী তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার-দ্বার খুলে দিলেন···দেশে-দেশান্তরে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে পাঠালেন··আয়োজন সব প্রস্তুত···

এমন সময় সহসা এলো মহাবিপত্তি·কোন্ ব্রাহ্মণ করবেন এই প্রতিষ্ঠায় পৌরোহিত্য? যে-সে পূজারী ব্রাহ্মণ দিয়ে তো এই কঠিন শাস্ত্রীয় ব্রত উদ্যাপিত হতে পারে না! তার জন্যে চাই আসল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ! কিন্তু শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তাঁরা কেউ পৌরোহিত্য করতে সম্মত নন্ তাঁরা একবাক্যে সকলে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সেই সঙ্গে এ-ও জানালেন যে, শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে দেবতার অন্নভোগ দেওয়াও অশাস্ত্রীয়!

রাসমণির মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো! এ-কথা তো উৎসাহের বশে তিনি কল্পনাও করেন নি! তবে কি বিশ্বের জননী তাঁর জননী নন্? শূদ্র-নারীর অন্তরের ভক্তি তবে কি বন্ধ্যা-নারীর সন্তান-প্রেমের মত নিরর্থক নিরবলম্ব? শাস্ত্র কি এমনি ভাবে তাঁকে দেবে শাস্তি?

কিন্তু সমস্ত নিরুৎসাহতার মধ্যে তাঁর মনে কে যেন বলতে লাগলো, নিশ্চয়ই এই পথ-হীনতার মধ্যে কোন ছিদ্র-পথ আছে··· নইলে শাস্ত্র এতো অমোঘ নিষ্ঠুর কখনো হতে পারে?

অশ্রু-কাতর অন্তরে রাণী পণ্ডিতদের কাছে বিধানের জন্যে লোক পাঠান। লোক ফিরে আসে, বিধান আসে না। স্নানযাত্রার দিন ক্রমশঃ এসে পড়ে।

১৪

ঝামাপুকুর টোলে রামকুমার যখন এই ব্যাপার শুনলেন, সেই ভক্তিমতী নারীর অন্তরের আকুলতার কথা জেনে, তিনি ব্যথিত হলেন। স্মৃতি-শাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় রাণীকে লিখে পাঠালেন, আপনি শোক করবেন না। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে আপনি যদি আপনার মন্দির কোন ব্রাহ্মণের নামে উৎসর্গ করে দেন, তাহলে এই সমস্যার সমাধান শাস্ত্রীয় ভাবেই হয় এবং তখন আপনার মন্দিরে দেবতার অন্নভোগেও কোন বাধা থাকবে না।

সেই বিধান পেয়ে রাণী যেন নব-জীবন পেলেন। সেই ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করে তিনি রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের জন্যে শিহোরের ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পুরোহিত রূপে পেলেন এবং ভব-তারিণীর মন্দিরের জন্যে রামকুমারকেই কাতর-ভাবে আমন্ত্রণ করে পাঠালেন। যতক্ষণ না অন্য পুরোহিত পাওয়া যায়, এই দায়িত্ব নিতে রামকুমার স্বীকৃত হলেন।

মহাধূমধামের সঙ্গে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য শেষ হয়ে গেল। ন'লক্ষ টাকা রাণী খরচ করলেন।

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে যাবার সময় রামকুমার গদাধরকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন। কিন্তু গদাধর মন্দিরের আশে-পাশে গঙ্গার ধারেই ঘুরে

বেড়ালেন। মন্দিরের কোনো কিছু আহার গ্রহণ করলেন না। মন্দিরের বাইরে গিয়ে এক পয়সার মুড়ি খেয়ে সেদিনটা কাটিয়ে দিলেন।

১৫

রামকুমার বহুভাবে বোঝালেন। গদাধর কিছুতেই সম্মত হলেন না। পরের কাছে কাজ করতে গেলে, তার হুকুম মেনে চলতে হবে···নিজের বলতে কিছু থাকবে না। শৃঙ্খল তিনি পরতে পারবেন না। তাতেও কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু পাগল আর এক বিপত্তি করে বসলো, সেখানকার অন্নও গ্রহণ করবে না।

অলক্ষ্যে হাসলেন ভব-তারিণী। শেষকালে ব্যবস্থা হলো, গঙ্গার ধারে দিনান্তে তিনি নিজের হাতে ভাতে ভাত রেঁধে নেবেন।

তাই চলতে লাগলো ব্যবস্থা। সারাদিন গঙ্গার ধারেই দিন কেটে যায় পাগলের। বড় ভালো লাগে গঙ্গা।

১৬

কাজের যখন কোন সাহায্যই গদাধরের কাছ থেকে পাওয়া গেল না, তখন রামকুমার তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রামকে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন।

গদাধর তবু একজন সঙ্গী পেলেন। নিজেকে আর রাঁধতে হয় না। হৃদয়ই রান্না করে দেয়। সেবা করে। ভালবাসে।

রামকুমার হৃদয়কে দিয়ে গদাধরকে মন্দিরে কাজ নেওয়াবার চেষ্টা করাতে লাগলেন। হৃদয় বলে, গদাধর শোনেন। এই পর্যন্ত।

রাণী আসেন, মথুরবাবু আসেন, গদাধর দূরে দূরে সরে বেড়ান। একদিন হঠাৎ মথুরবাবু দেখেন, একটী সুন্দর মাটীর শিব ঠাকুর। কি অপরূপ তার গড়ন! খবর নিয়ে জানলেন, ছোট পুরোহিত গড়েছেন। রামকুমারকে ডেকে বলেন, আপনার ভাইকে মন্দিরের কাজে লাগানো যায় না? এমন সুন্দর যাঁর হাতের কাজ, মা ভব-তারিণীর বেশকার যদি তিনি হন···

রামকুমার আবার অনুরোধ করেন···মথুরবাবুও অনুরোধ করেন···

হৃদয় এবার জোর করে চেপে ধরে, কেন, এ কাজ করতে আপনার আপত্তি কি, আমাকে বলতে হবে!

গদাধর বলেন, দেখিস্ নি, ভব-তারিণীর কত সোনার গয়না? ও সবের ভার আমি নিতে পারবো না···

হৃদয় বলে, বেশ, তার দায়িত্ব আমি নেবো! তা হলে তো তোমার আপত্তি নেই?

বিশ্ব-জননীর বিগ্রহের সামনে এসে দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণ!*

---

* গদাধর নামের পরিবর্তে কখন যে তিনি রামকৃষ্ণ নামে পরিচিত হন, তার কোন সঠিক ইতিহাস আজও পর্যন্ত জানা যায় নি। আমরা অতঃপর তাঁকে রামকৃষ্ণ নামেই উল্লেখ করবো। অনেকে অনুমান করেন যে, ঐ নামটি মথুরবাবুর দেওয়া। কারো কারো মতে ভৈরবী ব্রাহ্মণীই রামকৃষ্ণ নামটি দিয়েছিলেন। কারো মতে রামকৃষ্ণ নাম দিয়েছিলেন তাঁর পিতা।

১৭

চলে আকর্ষণ…ঘটনার নেপথ্য-বিধান…লোকচক্ষুর অন্তরালে মহাকালের দিব্য-লীলা…সারাদিন আপনার মনে মন্দিরের সেই আধো আলোয়, চলে পাষাণ-বিগ্রহকে নিয়ে খেলা…কাপড় পরানো, ফুল দিয়ে সাজানো, ঘুম থেকে জাগানো, আবার ঘুমের জন্যে শোয়ানো …সারা দিন…সারা বেলা…

ছোট্ট শিশু পুতুল খেলায় যেমন সব যায় ভুলে, রামকৃষ্ণ যেন সব ভুলে যেতে চল্লেন…মানুষ নয়…জন নয়…হাসি নয়…কথা নয়…শুধু সেই পুতুল…আর তিনি…

সাজাতে সাজাতে কখনো বা ভুলে যান সাজাতে…একদৃষ্টিতে থাকেন চেয়ে…

দেখেন…রক্তাম্বরা…পদতলে মূর্চ্ছিত শিব…এক হাতে মৃত্যু…আর হাতে বরাভয়…কণ্ঠে নৃ-মুণ্ড-মালা, রক্ত-জবার মালার মত…মৃত্যুময়ী বিশ্বের জননী…আলুলায়িত কালো কুন্তলে নিখিলের রাত্রির অন্ধকার …ও কি শুধু পাথরে-গড়া পুতুল ?

মুগ্ধ-বিস্ময়ে বেশকার সেই পাষাণ-বিগ্রহের দিকে চেয়ে থাকেন… চেয়ে থাকতে থাকতে চেতনা হয়ে আসে লুপ্ত… মনে হয় যেন ও কালো পাষাণ পাষাণ তো নয়, ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে আঙুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করেন, এই তো তপ্ত…কোমল…কান্ত স্পর্শ পাচ্ছি…ঐ তো বদ্ধ ওষ্ঠ যেন উঠলো নড়ে…উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চেষ্টা করেন কি সে বাণী…সব-ইন্দ্রিয় হয়ে ওঠে সজাগ…ঐ তো বাতাসে দুলে উঠলো

ঘন কৃষ্ণ কেশরাশ…দুলে উঠলো নিখিল অম্বর…সে অম্বরে ক্লান্ত-পক্ষ বিহঙ্গমের মত হারিয়ে যায় তাঁর দেহ-মন-আত্মা…

ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হৃদয় দেখে, প্রতিদিন যেন রামকৃষ্ণ আরো গম্ভীর হয়ে যাচ্ছেন আরো উদাস…যেন একটা পাথরের মূর্তি…মানুষ দেখলেই ভীত হরিণ শিশুর মত পালিয়ে যান, অরণ্যের গহনতায়…আত্ম-সৃষ্ট নির্জনতায়।

মন্দিরের কাজের পর আর তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না…গঙ্গার ধার ধরে একা চলেছেন হেঁটে…রাত্রি হয়ে যায় গভীর…তবুও আসেন না ফিরে…শেষ রাত্রিতে কোথা থেকে আসেন ফিরে…মুখ-চোখ ফোলা…রক্ত-জবার মত লাল চোখ…যেন সারারাত ধরে কেঁদেছেন।

হৃদয় জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু কোন উত্তর পায় না… পাথরের মানুষ কথা কয় না।

১৮

জন্মাষ্টমীর পরের দিন বিকেল বেলা যথারীতি ক্ষেত্রনাথ রাধাগোবিন্দের বিগ্রহকে পাশের ঘরে বিশ্রামের জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন…

এমন সময় পা পিছলে পড়ে গিয়ে গোবিন্দ-বিগ্রহের একটী পা ভেঙ্গে গেল…

ভগ্ন-বিগ্রহ…সারা মন্দিরের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল…তৎক্ষণাৎ সংবাদ গেল রাণী এবং মথুরবাবুর কাছে…ক্ষেত্রনাথের চাকরী গেল…

কিন্তু ভগ্ন-বিগ্রহ নিয়ে কি হবে? রাণী পণ্ডিতদের মতামত নিলেন··· ভগ্ন-বিগ্রহের পূজা হতে পারে না···গঙ্গাজলে তাকে দিতে হবে বিসর্জন··· রাণীর অন্তর কেঁদে উঠলো···এত আদরের বিগ্রহ, তাকে ফেলে দিতে হবে গঙ্গাজলে? কিছুতেই মন তাতে সাড়া দেয় না···অবশেষে কি মনে হলো, মথুরবাবু বল্লেন, একবার ছোট পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না?

রাণী স্বয়ং এসে রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন। সমস্ত শুনে তিনি বল্লেন, আমি মূর্খ লোক···শাস্ত্র জানি না···তন্ত্র জানি না···তবে একটা সোজা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার কোন জামাই-এর যদি কোন কারণে একটা পা ভেঙ্গে যায়, আপনি কি তাঁকে গঙ্গাজলে বিসর্জন দেন?

অন্তরের কথা অন্তরে গিয়ে লাগে। সেই একান্ত সহজ স্বচ্ছ কথা রাণীর অন্তর স্পর্শ করলো। একথা তো তিনি একবারও ভাবেন নি··· সবাই দেখে এসেছে, বিগ্রহকে বিগ্রহরূপে, শাস্ত্রের নিয়মে বাঁধা।

এই উন্মাদ কি তবে পেয়েছে, পাষাণের অন্তরালে সেই পাষাণীকে দেখতে···? নইলে কোথা থেকে এলো তার এই বিশ্বাস, এই আত্মীয়তা?

রাণী রাসমণি বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকেন পাগলের দিকে।

১৯

রাধা-গোবিন্দের পূজোর ভার পড়লো রামকৃষ্ণের ওপর। রামকৃষ্ণ আর কোন আপত্তি করলেন না।

পূজো করতে বসেন, যথারীতি আসন-শুদ্ধি করেন…সেই সঙ্গে মনে হয় যেন জগৎ-সংসার সব আড়ালে পড়ে গেল…সমস্ত বিশ্ব ব্যেপে শুধু রইলো, পূজারী আর পূজার ঠাকুর…সময় চলে যায়…লোক চলে যায়…বেলা চলে যায়…পূজারী আসন থেকে ওঠে না…

অতন্দ্র-দৃষ্টি হৃদয় চুপটী করে দাঁড়িয়ে দেখে…আত্মীয় নয়…বন্ধু… আত্মার আত্মীয়…মহাসাধকের সাধনার একমাত্র সাক্ষী…দিব্য-দেহের যেন মর্ত্য ছায়া…

বহুকষ্টে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে হয় হৃদয়কে…বহু চেষ্টা করে…

রামকুমার এই পরিবর্তন দেখে যেমন হলেন সন্তুষ্ট, তেমনি আবার রামকৃষ্ণের সেই অসীম উদাসীনতা দেখে ভীত হয়ে উঠলেন। হৃদয়ের মুখে শুনলেন, সারা দিন সারা রাত একা একা কোথায় ঘুরে বেড়ান বনে জঙ্গলে কেউ জানে না। রামকুমার স্থির করলেন, তাঁকে আরো দৃঢ় ভাবে বাঁধতে হবে মন্দিরের কাজে…

বল্লেন, আমি বুড়ো হয়েছি, মার পূজোর দীর্ঘ সব প্রক্রিয়া আর পারি না…এবার থেকে তোকে সে ভার নিতে হবে।

রামকৃষ্ণ প্রতিবাদ করেন না…বড় ভাল লাগে সেই পাষাণ-কালো পাষাণীকে। শুনেছি, সে কোলে নিয়েছে রামপ্রসাদকে, চোখের জল মুছিয়েছে কমলাকান্তের, কাঁদিয়েছে কত পাগল ক্ষেপাকে…সে কি মিথ্যে কথা? কল্পনা?

কিন্তু মন্দিরে প্রতিদিন তার পূজো…তার যে বহু নিয়ম কানুন… বহু-মন্ত্র বহু-তন্ত্র…অধিকারী না হলে তো কেউ পারে না পূজোয় বসতে।

রামকুমার বল্লেন, আমি তোকে শেখাবো নিজের হাতে।

কিন্তু তার আগে চাই দীক্ষা। অধিকার-অর্জন।

রামকুমার তাঁকে নিয়ে গেলেন সাধক কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে, তন্ত্র-গুরু।

যথারীতি ক্রিয়াকাণ্ডের পর রামকৃষ্ণ গুরুর সামনে আসনে বসলেন। হোম-অন্তে কেনারাম তাঁর কর্ণে মাতৃ-মন্ত্র উচ্চারণ করলেন···

সঙ্গে সঙ্গে, জ্যা-চ্যুত তীরের মত, রামকৃষ্ণ হুংকার দিয়ে আসন থেকে লাফিয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ মাটীতে পড়ে গিয়ে অচৈতন্য হয়ে গেলেন। সমাধি।

২০

মথুরবাবু এসে ধরে বসলেন, এবার থেকে মা ভব-তারিণীর পূজো আপনাকেই করতে হবে!

রামকৃষ্ণ বলেন, কেমন করে পূজো করতে হয়, তা তো আমি জানি না এখনো!

মথুরবাবু বলেন, আমরা তা জানি না। আপনার যেমন ভাবে পূজো করতে ইচ্ছে যায়, তেমনি ভাবেই করবেন।

রামকৃষ্ণ রাজী হন···

অশান্ত ছেলেকে মা একটু একটু করে নিজেই টেনে নেন তাঁর কাছে।

সংসারী লোকের সংস্পর্শ ক্রমশঃ যেন বিষিয়ে উঠতে থাকে। মানুষের ছায়া দেখলে শিউরে ওঠেন। সারা দিন একলা একলা আপনার মনে কি বকেন।

পূজোয় বসেন কিন্তু সামনে কোন বিগ্রহ আর দেখতে পান না…

ভুলে যান পূজোর মন্ত্র…বিধি…বিধান…অনুষ্ঠান…লোকে দেখে, আসনে বসে আছে পাথরের মূর্তি, দু'চোখ দিয়ে শুধু বইছে জলের ধারা…জীবনের একমাত্র লক্ষণ…

সামনে পাষাণ বিগ্রহ…আর তার সামনে পাষাণ-মূর্তি পূজারী…

তারপর যেই সন্ধ্যা হয়ে যায়…আরতি হয়ে যায় শেষ…মন্দিরের ত্রিসীমানায় আর দেখা যায় না পূজারীকে…

হৃদয় ভেবে আকুল…

একদিন ঠিক করলো, লুকিয়ে পিছু নিয়ে দেখবে…

গঙ্গার ধার দিয়ে অন্ধকারে চলেছে উন্মাদ…নিস্তব্ধ অন্ধকারে শোনা যায় গঙ্গার মৃদুমর্মর…সেই সঙ্গে হৃদয়ের কানে আসে চাপা কান্না…কে যেন রুদ্ধ কণ্ঠে কাঁদছে, মা, মা…নিঃশব্দে অনুসরণ করেন… মন্দিরের বাগান ছাড়িয়ে চলে পাগল…সামনেই গভীর বন…শ্মশান বলে ভয়ে কেউ যায় না সেদিকে…ভয়ে হৃদয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে…মাথার ওপর দিয়ে হঠাৎ কাল-পেঁচা চীৎকার করে উড়ে চলে গেল…ঝোপের মধ্যে শেয়াল চলাফেরা করছে…শুকনো পাতার ওপর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে…হৃদয় দেখে পাগল সেই বনের ভেতর

ঢুকে পড়লো··একা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হৃদয়ের ভয় করতে লাগলো···ফিরে এলো সেদিনের মত···

ভোর বেলা ফিরে এলেন রামকৃষ্ণ···দুচোখ রক্তজবার মত লাল ·· কোন কথা নেই মুখে···

সেদিন রাত্রিতে আবার হৃদয় নিল পিছু···ঠিক সেই বনের ধারে এসে থমকে দাঁড়ালো হৃদয়···পাগলকে ভয় দেখাবার জন্যে সেখান থেকে ঢিল ছুঁড়তে লাগলো···কিন্তু পাগলের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই·· বনের মধ্যে ঢুকে চলে গেল···সাহসে ভর করে হৃদয়ও ঢুকলো··· দেখলো, বনের ভেতরে এক আমলকী গাছের তলায় পাগল গিয়ে বসেছে···দিগম্বর·· অঙ্গে কোন আবরণ নেই···এমন কি পৈতেটা পর্যন্ত নেই।

ভয় দেখাবার জন্যে হৃদয় ঢিল ছুঁড়তে লাগলো···কিন্তু আমলকী গাছের তলায় যেমন পদ্মাসনে পাগল বসেছিল, তেমনি বসে রইলো···

নিরাশ হয়ে হৃদয় ফিরে এলো। সেদিন ভোর বেলায় হৃদয় চেপে ধরলো, বনের ভেতর আপনি কি করেন ?

—মাকে ডাকি···ভারি সুন্দর নির্জন জায়গা···

—কিন্তু গায়ে কাপড় নেই, পৈতে পর্যন্ত নেই ? সে কি ব্যাপার ?

—পৈতে থাকলে মনে হবে আমি বামুন আমি একটা আলাদা জাত···মার কাছে যেতে হলে ও জাতের বালাই ফেলে রেখে যেতে হবে···সব ছেড়ে, শুনেছি তবে তাকে পাওয়া যায়। ওরে, বল্, তাকে পাব না ? বল্ ?

দর্ দর্ ধারায় দুচোখ দিয়ে পাগলের জল ঝরে পড়ে।

২১

কবে কৃষ্ণ চলে গিয়েছিলেন মথুরায়, বৃন্দাবনের পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছিল শ্রীমতী, কেঁদেছিল গোপিনী, গোপ-বালকের দল, কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছিল পিতা নন্দ, মাতা যশোদা···কেঁদেছিল নন্দকুলের শ্যামলী ধবলী, কেঁদেছিল বৃন্দাবনের তরুলতা···শ্যাম-বিরহে উন্মাদ···

সে-কান্না··সে-বিরহ···হারায় নি···হারায় না তা···আবার আর একদিন পুঞ্জীভূত হয়ে নেমেছিল এই বাংলায়, এই গঙ্গার তীরে, আর এক ঘরছাড়া উন্মাদের অন্তরে···তার কান্নায় ভিজে গিয়েছিল নদীয়ার গঙ্গা-মাটীর বুক।

মহাশূন্যে নিরাবলম্ব এত দিন ছিল সে বিরহের বাষ্প, মহাকালের অঙ্গ-লীন···বিশ্ব-স্রষ্টার জন্যে সৃষ্ট-জীবের অনাদি আকুতি।

নেমে এলো, মহাশূন্যের নিরাবলম্বতা ত্যাগ করে, নতুন দিব্য আধারে··· আর এক মানুষের অন্তরে···অজস্র অশ্রুর ধারায়···

পূজা নেই·· মন্ত্র নেই·· অর্ঘ্য নেই·· আরতি নেই···শুধু এক বিশ্ব-বিদারী কান্না···দেখা দাও···দেখা দাও! যেমন করে দেখছি তোমার তৈরী, এই গাছ-পালা, পথ-ঘাট, পৃথিবী, তেমনি করে মূর্তি ধরে এসো তুমি দৃষ্টির সামনে···স্পর্শের মধ্যে···

রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে উঠে শিশু-পুত্র, পাশে জননীকে না দেখতে পেয়ে, যেমন আর্ত অসহায় ভাবে ক্রন্দন করে ওঠে,

তেমনি মাতৃ-বিরহ-বেদনায় রামকৃষ্ণের অন্তর অসহ্য জ্বালায় কেঁদে উঠলো·· লোক-জন, ঘর-বাড়ী, বিশ্ব-প্রকৃতি সব যেন এক চির-রাত্রিতে গিয়েছে ডুবে···আর সেই অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে একা চলেছে পাগল··· শুধু মুখে একটি কথা, মা···মা·· অন্তরে শুধু এক ভাব, এক ভাবনা, তুমি দেবে দেখা···কিসের এ চোখ, যদি চাইলে, না দেখতে পেলাম তোমাকে? কিসের এ জীবন, যদি চাইবার মাত্র না পেলাম তোমার স্পর্শ!

পূজো করতে বসেন কিন্তু সে-পূজোর ধারা আলাদা···মন্ত্র গলে গিয়ে অশ্রু হয়ে ঝরে—নিথর নিস্পন্দ কখনো বসে থাকেন আসনে··· বেলা বয়ে যায়, দিন চলে যায়···রাত চলে যায়···বসেই আছেন আসনে···কখনো বা শিশুর মতন কেঁদে ওঠেন···ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রতিমার পায়ে, শিশু যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের বুকে···কখনো বা প্রতিমার পায়ে ফুল দিতে, নিজের মাথাতেই ফুল ছড়িয়ে দিয়ে হেসে ওঠেন···কখনো নৈবেদ্য তুলে নিয়ে পাষাণীর মুখের কাছে ধরেন, চুপটী করে বসে দেখেন, বাতাস করেন, যেন জননী সামনে বসে সত্যিই অন্নগ্রহণ করছেন···তারপর কি মনে করে নিজেই খেয়ে ফেলেন, নয়তো বা বাইরে এসে পাখীদের ডেকে খাইয়ে দেন···সন্ধ্যা বেলা আরতি করতে গিয়ে পঞ্চ-প্রদীপ দোলাতে দোলাতে সময়ের জ্ঞান সব ফেলেন হারিয়ে···পূজো হয় না শেষ—আরতি করেই চলেছেন···

মন্দিরের কর্মচারীরা প্রথম প্রথম দেখে ভাবতো, পুরোহিতের মাথা বোধ হয় খারাপ হয়ে আসছে···ক্রমশঃ তাদের ধারণা বদ্ধমূল হলো যে নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নইলে শ্যামা-পূজায় কেউ এইসব অনাচার করতে পারে? সেই সব অনাচার দেখে তারা শিউরে উঠতো···

বারণ করতো···রামকৃষ্ণ যেন কিছুই শুনতে পেতেন না···শেষকালে নিজেদের কর্তব্য-জ্ঞানে তারা শাসাতে আরম্ভ করলো···বল্লে, রাণীমাকে তারা সব বলে দেবে··এ অনাচার রাণীমা সহ্য করবেন কেন ?

ক্রমশঃ সমস্ত কথা রাণী রাসমণির কানে গিয়ে উঠলো। কর্মচারীদের বিবরণ থেকে তাঁর মনে তীব্র কৌতূহল জাগলো। আর কেউ তখন না জানলেও, এই ভক্তিমতী নারী, নারীর সহজ আন্তরিকতা থেকে বুঝেছিলেন, লোকে যাই বলুক, এ-মানুষ সাধারণ মানুষের মত নয়। তাই তিনি ঠিক করলেন, গোপনে গিয়ে দেখবেন, সত্যিই কি হচ্ছে।

যেদিন রাণী আসবেন, মন্দিরের একজন কর্মচারী রামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে জানালো, ঠাকুর, বলেছিলাম তোমাকে···তখন শোননি···রাণী আসছেন···দেবেন তোমাকে তাড়িয়ে···

ছোট্ট ছেলের মত কি-এক-অজানা ভয়ে রামকৃষ্ণের সারা মুখখানি যেন শুকিয়ে মলিন বিবর্ণ হয়ে গেল···চেয়ে থাকতে থাকতে দু'চোখ দিয়ে অনর্গল জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো···রুদ্ধ-অভিমানে বালকের মত অধরোষ্ঠ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো···

রাণী মন্দিরে এসে দেখেন, কোথায় পুরোহিত, আসন শূন্য পড়ে রয়েছে··চারিদিকে খুঁজে কোথাও সন্ধান পেলেন না···শেষকালে মন্দির-ঘরে ঢুকে ভাল করে চেয়ে দেখেন, প্রতিমার আড়ালে, জননী ভব-তারিণীর আঁচল ধরে, ভীত, সন্ত্রস্ত শিশুর মত জড়সড় হয়ে বসে আছেন, দু'চোখ দিয়ে নীরবে জলের ধারা গড়িয়ে পড়েছে···মার কাছ-ছাড়া হবার ভয়ে শিশু মার আঁচলের আড়ালে লুকিয়েছে···

সে-মহাদৃশ্য দেখে রাণীর চোখ অশ্রু-বাষ্প-ময় হয়ে উঠলো⋯ অন্তর থেকে সেই মহীয়সী নারী বলে উঠলো, মাগো, আমি ধন্য⋯আমি ধন্য⋯

২২

সেইদিন থেকে মথুরবাবু কর্মচারীদের ডেকে বলে দিলেন, কেউ যেন কোনভাবে পুরোহিতকে কোন কথা না বলে⋯তাঁর যা ইচ্ছা, তিনি তাই করবেন মন্দিরে।

এত যে কাণ্ড হচ্ছে, রামকৃষ্ণ কিছুই জানেন না⋯

এক একটা দিন চলে যায়, আর গঙ্গার ধারে পাগলের মত কাঁদতে-কাঁদতে বলে বেড়ান, কৈ⋯আজকের দিনও তো চলে গেল⋯এলি না আজও মা !

সন্ধ্যাবেলা গ্রাম্য নারীরা সেই পথ দিয়ে যেতে, তাঁকে কাঁদতে দেখে থমকে দাঁড়ায়· নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, আহা, মা মারা গিয়েছে, বেচারা⋯

সারারাত রাত্রির প্রেতমূর্তির মত নিদ্রাহীন চোখে গঙ্গার তীরে তীরে ঘুরে বেড়ান, কখন হাসেন কখন কাঁদেন, কখন ধূলোয় পড়ে লুটোলুটি খান আর মুখে শুধু সেই এক কথা, দেখা দে, দেখা দে মা ! আমি যদি মিথ্যে না হই, তুই কেন মিথ্যে হবি ?

একদিন সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে পুজো করতে এসে আসনে বসলেন⋯ সারা দেহমন যেন গামছা-নিংড়ানোর মতন করে অসহ্য যাতনায় ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো, ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো তলোয়ারের ওপর !

লাফ দিয়ে উঠে তলোয়ারটা টেনে খুলে ফেল্লেন···যদি এ চোখ না দেখলো তোকে, কি দরকার এ চোখে! শেষ করে দেবো আজ এ অসহ্য জ্বালা!

এই বলে তলোয়ারটা তুলে যেই চোখের ওপর তুলবেন, অমনি দেখেন, সারা ঘর আলোয় আলো হয়ে গেল···আর সেই আলোর মধ্যে ফুটে উঠলো, আলোর কমলের মত নিখিল-আলোর প্রসবিনী, বিশ্বের জননী···

নিমেষে গেল দূর হয়ে, সব সংজ্ঞা, অচৈতন্য দেহ পড়ে রইলো মাটীতে ···পুরো একটা দিন চলে গেল···সবাই স্তম্ভিত বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে···দিনান্তে যখন জ্ঞান হলো, তখন শোনা গেল, অস্ফুটস্বরে শুধু বলছেন, মা···মা···মা···

২৩

সেই দিনের পর থেকে ঠাকুর আর পূজারীর সম্পর্ক একেবারে গেল ঘুচে। এতদিন যে বিগ্রহকে মনে হতো চৈতন্যময়, আজ আর তাকে বিগ্রহ বলেই মনে হয় না। সে যেন জীবন্ত মূর্তি, রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ জননী।

সারাদিন ছোট ছেলের মত মার সঙ্গে থাকেন, মার সঙ্গে কথা বলেন, আবদার করেন। অন্ন সাজিয়ে খেতে ডাকেন···আয়, বেলা যে হয়ে গেলো···

পাখা নিয়ে বাতাস করেন ··কখনো বলে ওঠেন, তোর সঙ্গে আমি খাব, বেশ! নৈবেদ্য নিজেই খেতে আরম্ভ করেন।

খাওয়া হয়ে গেল, মার বিছানার কাছে গিয়ে, শুয়ে পড়েন, যেন ছোট ছেলে মার কোলের কাছে ঘুমিয়ে পড়লো···

রাত্রি হলে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, হৃদয় দেখে, পঞ্চবটীর সেই আমলকী তলায় গিয়ে বসে আছেন···চোখের পাতা খোলা···সারা রাত একবারও চোখের পাতা বোজেন না···

চোখের পাতা বুজলে যদি সেই অবসরে সে এসে চলে যায়!

মাঝে মাঝে স্পষ্ট মনে হয়, যেন বাতাসে এলো তার দেহের সুবাস···গায়ে এসে লাগলো তার তপ্ত নিঃশ্বাস···রাত্রিবেলা আরতির আলোয় দেখি ছায়াহীন তার মূর্তি···বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে থাকি···কই ···দেওয়ালে তো পড়ে না ছায়া···কানে এসে লাগে, কে যেন বাইরে সিঁড়ি দিয়ে চলে গেল, তার পায়ের নুপূর বেজে উঠলো ঝম্‌ঝম্···ছুটে বাইরে গিয়ে দেখি, মন্দিরের ওপরের চত্বরে দাঁড়িয়ে, এলো চুল বাতাসে উড়িয়ে চেয়ে আছে গঙ্গার দিকে···

দেখতে দেখতে আবার হারিয়ে যায় সব···একটী মুহূর্তের দেখা··· এক ঝলকের পরিচয়···অলোকসম্ভব অস্তিত্বের শুধু ক্ষণিক আলোক-ইঙ্গিত···

মন কেঁদে ওঠে আবার···ক্ষণিকের দেখা নয়···নিমেষের স্পর্শ নয়···অনন্ত ক্ষুধা···দুর্বার পিপাসা···চাই নিত্যকাল ধরে তোকে ধরে রাখতে···নিত্য আলোর মত তুই থাকবি আমার সামনে···যখনি এ নয়ন মেলে চাইবো, এ নয়নে শুধু দেখবো তোর দিব্য রূপ···

ঈশ্বর-উন্মাদনায় রামকৃষ্ণ জাগ্রত অবস্থায় সমস্ত বাহ্য জ্ঞান ফেল্লেন হারিয়ে···আশে-পাশে কারা আসে যায়—চোখে পড়ে না তাদের···

চারিদিকে এই সংসার থেকে উঠছে কত কথা, কত কলরব, কিছুই প্রকাশ করে না শ্রবণে⋯মন চলে গিয়েছে অদৃশ্য আর এক লোকে⋯ সেইখানেই নিত্য করেন বাস⋯সেখানকার বিচিত্র সব দৃশ্য ক্ষণে ক্ষণে চোখের সামনে ভেসে ওঠে⋯আবার মিলিয়ে যায়⋯তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে হাহাকার⋯⋯

২৪

মনে পড়ে যায় হনুমানের কথা⋯নিজের বুক চিরে দেখিয়েছিলেন, সেখানে রয়েছে রামসীতার যুগলমূর্তি⋯তিনি তো পেয়েছিলেন নিত্যরূপে শ্রীরামচন্দ্রকে⋯তবে আমিও পাব না কেন?

সুরু হয় সেই ভাবনা⋯ভাবতে ভাবতে ভুলে যান নিজের মানব-সত্ত্বা⋯একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় মানুষের অভ্যাস, চলাফেরা, ভাষা পর্যন্ত⋯ভেতর থেকে হয়ে যায় পরিবর্তন⋯যে পরিবর্তন আনতে সাধকদের যুগ-যুগ ধরে কঠোর সাধনা করতে হয়েছে, নিমেষে অন্তরে ঘটে যায় সে মহা-পরিবর্তন⋯তার আন্তরিক প্রেরণায় বদলে যায় তাঁর দেহ পর্যন্ত⋯হনুমানের মত লাফিয়ে চলেন⋯বিচিত্র শব্দ উচ্চারণ করেন⋯গাছের ওপর ডালে পা ঝুলিয়ে থাকেন বসে⋯

এ পরিবর্তন বাইরের আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন নয়⋯চিন্তার ঐকান্তিকতায় এই মানুষের মনে জন্ম নেয় সেই দিব্যশক্তি, যে-শক্তি তাকে কীট থেকে ভগবান্ পর্যন্ত করে তুলতে পারে⋯যার প্রেরণায় সে পারে তৃণে, তরু-পল্লবে, এই বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে আত্মরমণ করতে⋯

এই বিজ্ঞান ধর্মী অবিশ্বাসী যুগে, লোকচক্ষুর অন্তরালে সেদিন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-শতকে সুরু হয় সেই মহা-পরীক্ষা…আধুনিক জগতের সর্ব-শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা…যন্ত্রের শক্তির পরীক্ষা নয়…মানব-মনের শক্তির পরীক্ষা…কি দিব্য-শক্তি নিহিত আছে এই ক্ষণ-ভঙ্গুর মানুষের দেহে…সুরু হয় নতুন করে তার আবিষ্কার !

রামকৃষ্ণের অজ্ঞাতে বদলে যায় তাঁর দেহ-মন-ভঙ্গী…যেই ভাব, যেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব !

দেখেন, একদিন রাত্রিকালে, পঞ্চবটীর আমলকী তলায় বসে আছেন, গঙ্গার দিক থেকে দিব্যমূর্তি এক নারী তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন… কি স্নিগ্ধ করুণ, মধুর হাসি…দেখতে দেখতে সহসা তাঁর চিত্তভূমি উদ্ভাসিত করে জেগে উঠলো এক অপূর্ব চেতনা…চিনেছি…চিনেছি… তোমাকে জননী…এস হনূমানের হৃদয়-আরাধ্যা…আদিকবি-স্তুতা…এস মা রামগেহিনী…ভক্ত-হৃদয় অবারিত করে রেখেছি--তুমি রাঙা চরণ রাখবে বলে…

দেখতে দেখতে সেই নারী যেন দেহ মধ্যে এসে লীন হয়ে গেল… গভীর সমাধিতে রামকৃষ্ণ সব চেতনা ফেল্লেন হারিয়ে…

২৫

রাণী রাসমণির কানে গিয়ে যখন পৌঁছল যে রামকৃষ্ণ উন্মাদ হয়ে গিয়ে গাছে বসে থাকেন, কারুর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেন না, তিনি বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মথুরবাবুর মনে হলো কঠোর সাধনার ফলে বোধ হয় মানসিক বিকার ঘটেছে…চিকিৎসার প্রয়োজন…

সাক্ষাৎভাবে সমস্ত ব্যাপার অবগত হবার জন্যে রাণী মন্দিরে এলেন। গঙ্গাস্নান করে মন্দিরে এসে বসলেন। রামকৃষ্ণ তখন আসনে ধ্যানস্থ। নীরবে তিনি বসে দেখছেন, সেই ধ্যানস্তিমিত রূপ।

সহসা রামকৃষ্ণের ধ্যান গেল ভেঙ্গে। তিনি সোজা উঠে রাণীর গালে একটা চড় মারলেন, ছিঃ, এখানে এসেও ঐ সব ভাবনা!

মন্দিরের সামনে কর্মচারীরা যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা তো ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল! পাগলেব এবার আর নিস্তার নেই! রাণীর গায়ে হাত!

কিন্তু তারা অবাক হয়ে গেল. যখন দেখলো, রাগ করা দূরে থাকুক, গলায় আঁচল জড়িয়ে রাণী মাটীতে লুটিয়ে সেই পাগলের পায়ের ধূলো মাথায় মেখে নিলেন।

লজ্জিত হযে রামকৃষ্ণ বলেন, ওরে, আমার দোষ নেই··· আমি তোর গায়ে হাত তুলিনি···আমি কি করবো, মা যে আমার হাত তুলে তোকে মারলো!

রাণী সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বল্লেন, আমারই অপরাধ··· আমি বুঝেছি···

রাণী রাসমণি মন্দিরে ঢুকে সারাক্ষণ ধরে মামলার কথাই ভাবছিলেন···অন্তর-দ্রষ্টা সাধকের দৃষ্টি এড়াতে পারেন নি।

২৬

কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে মথুরবাবু নিয়ে এলেন। রামকৃষ্ণের কোন ওজর-আপত্তি শুনলেন না। কিন্তু ব্যাধি তো দেহের নয়!

মথুরবাবু তবুও বুঝিয়ে বলেন, এমন করে শরীরকে অযত্ন করা ঠিক নয়। সবাই নিয়ম মেনে চলছে···এমন কি ভগবানও তাঁর নিয়মে বাঁধা!

য়ুরোপের নতুন আমদানী বিজ্ঞানবুদ্ধি! রামকৃষ্ণ চমকে উঠেন, বলেন, সে কি কথা! যার নিয়ম ইচ্ছে করলেই সে সে-নিয়ম ভাঙ্গতে পারে···কোন নিয়মের বশ সে নয়!

শিক্ষিত মথুরবাবু তর্ক করেন।

বলেন যে-গাছে লাল ফুল হয়, চিরকাল তাতে লাল ফুলই ফুটবে··· হঠাৎ কোন ভগবানের ইচ্ছেয় লাল ফুলের গাছে শাদা ফুল হবে না!

রামকৃষ্ণ কিছু আর বল্লেন না!

রাত্রিতে মাকে ডেকে বলেন, মথুর এ কি বলছে মা! সবার মতন তুই-ও তবে তুচ্ছ নিয়মে বাঁধা? সারা রাত্রি নিদারুণ যন্ত্রণায় কাটে।

ভোর বেলা গঙ্গার দিকে যেতে দেখেন, লাল জবার গাছে, এক বোঁটাতে পাশাপাশি দুটী ফুল ফুটেছে···একটা রক্ত-রাঙা···আর একটা দুগ্ধ-শুভ্র···

আনন্দে রামকৃষ্ণের অন্তর উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বোঁটা শুদ্ধ ফুল দুটো নিয়ে মথুরবাবুর সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে ওঠেন, দেখ, শালা, সে ইচ্ছে করলে পারে কি না!

মথুরবাবু সেদিন থেকে তর্ক করা ছেড়ে দিলেন।

২৭

কিন্তু কবিরাজী চিকিৎসায় কোন সুফলই দেখা দিল না। তখন মথুরবাবু, কাউকে কিছু না জানিয়ে. ঠাকুরের চিকিৎসার এক নতুন ব্যবস্থা ঠিক করলেন।

বিজ্ঞান বলে যৌন-ক্ষুধা মানব-দেহের স্বাভাবিক বৃত্তি। জোর করে বাইরে থেকে তাকে অতৃপ্ত রাখলে, মানসিক বিকারের আকারে, সে নেয় প্রতিশোধ। তখন একমাত্র পন্থা হচ্ছে, দেহকে দেওয়া তার স্বাভাবিক ক্ষুধার সামগ্রী।

হায় দেহবাদী শিক্ষা! হায়, এ্যানাটমী!

একদিন মথুরবাবু নিজের ফিটনে করে ঠাকুরকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন।

দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়ে ফিটন টগ্‌বগ্‌ করতে করতে কলকাতায় এলো …সন্ধ্যা হয়ে আসছে…মেছুয়াবাজারে এক বাড়ীর সামনে এসে ফিটন থামলো।

ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে মথুরবাবু বাড়ীর ভেতর ঢুকলেন। একটা বড় ঘরে ঠাকুরকে বসিয়ে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে, ঠাকুরের কানে এলো, চাপা হাসি…বহু নারী-কণ্ঠের মৃদু মধুর কলোচ্ছ্বাস…দেখেন, এক দল সুবেশা তরুণী সেই ঘরে এসে ঢুকলো…রঙ্গ-ভঙ্গে দেহ তাদের চলতে গিয়ে যেন ঢলে পড়ছে…

বিদ্যুৎ-পৃষ্ট পথিকের মত রামকৃষ্ণ চমকে উঠলেন। নিমেষে তাঁর চোখের সামনে জেগে উঠলো, জগৎ-জননীর দিব্য-মূর্তি···নিস্পন্দ নিথর দেহ···শুধু মুখ থেকে অমৃত-বিন্দুর মত নিঃসন্দিত হচ্ছে···জগতের পবিত্রতম একাক্ষরা শব্দ···মা···মা···মা···

মোহিনীরা আর পারলো না এগুতে···দূর থেকে মাটীতে লুটিয়ে তারা করলো প্রণাম···

মথুরবাবু এসে দেখেন, ঘর শূন্য, ঠাকুর সমাধিস্থ···

লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, নির্বোধ আমি, ক্ষমা করুন আমাকে !

২৮

চন্দ্রা দেবী তখনো জীবিত···যদিও শোকে তাপে তখন একদম পড়েছেন ভেঙ্গে···

লোকমুখে ছেলের অসুখের কথা শুনে তাঁর মার মন অস্থির হয়ে ওঠে···বার বার চিঠি লেখেন···অন্তত কিছুদিনের জন্যেও যদি একবার আসে···

মার কাতর আহ্বানে রামকৃষ্ণ কামারপুকুরে এলেন···

বেছে বেছে খুব ভাল রোজা নিয়ে এলেন মা···রামকৃষ্ণ মনে মনে হাসেন···

রোজা মন্ত্র পড়ে···কত কি করে···ভূত কিন্তু ঘাড় থেকে নামে না···

মা ভাবেন, এ কি রকম ভূত! সবাই বলে, তা নয়, বিয়ে দাও …তেইশ বছরের সমথ ছেলে…বিয়ে দাও…সব ঠিক হয়ে যাবে…

চারিদিকে খোঁজাখুঁজি হয়…কিন্তু কোথাও মনের মত পাত্রী জোটে না…

মার মুখে হাসি নেই…মনে কোন সুখ নেই…

কাতর হয়ে ছেলে বলে, কিসের এতো ভাবনা তোমার মা ?

মা বলেন, বাবা, বুড়ো মার অনুরোধ তোকে বিয়ে করতেই হবে …এত খুঁজছি…কিন্তু কোথাও পাত্রী পাচ্ছি না !

রামকৃষ্ণ হেসে বলেন, তা আমাকে বলো নি কেন মা! এক্ষুণি জয়রাম বাড়ীতে লোক পাঠাও…রাম মুখুজ্জের বাড়ীতে…সেখানে আমার কুটো বাঁধা আছে যে !*

পাগলের সব কথার মত, আত্মীয়-স্বজন ভাবে, এ-ও পাগলের পাগলামী! কেউ আর সে-কথা ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। তবুও মা লোক পাঠালেন। খবর এলো, মেয়ে আছে বটে…ঠিকুজী-কুষ্ঠি সব মেলেও ঠিক… তবে মেয়ের বয়স মাত্র পাঁচ বছর…

চন্দ্রা দেবী বলেন, যখন অন্য কোথাও আর মিলছে না, ঐখানেই আমি বিয়ে দেবো !

* আজন্ম ব্রহ্মচারী হয়েও, বিবাহে যে তিনি কেন কোন আপত্তিই করেননি, বরঞ্চ নিজে পাত্রীর সন্ধান দিয়েছিলেন, তার তত্ত্ব রামকৃষ্ণ-জীবন যাঁরাই আলোচনা করেছেন, তাঁরাই জানেন। যথাসময়ে তা আলোচনা করা হবে।

দু'এক কথায় সব ঠিক হয়ে যায়।

পাঁচ বছরের মেয়ে সারদামণি দেবী—এলেন রামকৃষ্ণের ঘরণী হয়ে।

গরীব মা, সাধ গিয়েছিল দু'একখানা গয়না দিয়ে ছোট্ট বউটীকে সাজাবেন। ঘরে তো ছিল না, তাই লাহাদের বাড়ী থেকে দু'এক দিনের কড়ারে ধার করে এনেছিলেন।

বিয়ের পর সেগুলো দিতে হবে ফিরিয়ে। কিন্তু ছোট্ট মেয়ের গা থেকে কি করে নেওয়া যায় খুলে ?

চন্দ্রা দেবী ছেলেকে সব বল্লেন খুলে।

রামকৃষ্ণ হেসে বলেন, তার জন্যে ভাবছো কেন ?

সারদামণি ঘুমিয়ে আছে, এমন ভাবে হাত থেকে গয়না খুলে নিলেন ঠাকুর, যে ছোট্ট মেয়ে জানতেই পারলো না।

কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে বালিকা দেখে গয়না নেই। কেঁদে উঠলো। রাম মুখুজ্জে মেয়ে নিতে এসে যখন শুনলো যে, মেয়ের গা থেকে গয়না খুলে নেওয়া হয়েছে, তিনি রাগ করে তক্ষুনি মেয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

মার আদর-যত্নে দিন কেটে যায়···কিন্তু মনে মনে চলে ডাক··· ডাকে দক্ষিণেশ্বর···পঞ্চবটী···মায়ের মনের সাধ মিটিয়ে ঠাকুর চলে এলেন আবার দক্ষিণেশ্বরে।

২৯

কামারপুকুর, বৃদ্ধা জননীর কাতর মুখ···সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য··· নব-পরিণীতা বালিকা বধূ···ধোঁয়ায় মিলিয়ে গেল সব···যেন এ-জীবনের সঙ্গে তাদের আর নেই কোন সম্পর্ক···

মহা-আবর্ত আবার ফেলে গ্রাস করে···অসম্পূর্ণ সাধনার তীব্র বেদনায় বাঁশীর মত শত-ছিদ্র হয়ে যায় দেহ-মন···

যা হয়েছে সুরু করতে হবে তাকে শেষ···

দৃষ্টির অন্তরালে মহাকালের রঙ্গমঞ্চে চলে দিব্য-পরীক্ষা··শত শত বৎসরের ভারতের বহুমুখী সাধনার আজ হবে মহা-সমন্বয়···একটি জীবনের নির্দিষ্ট আয়ুর মধ্যে জেগে উঠবে একটা মহাদেশের সমস্ত অতীত জীবনের পুনরাবৃত্তি একটি জীবন···অনন্ত জীবনের প্রতীক··· সব বিচ্ছিন্নতা, সব বিভিন্নতা, সব বিতর্কের শেষ সমাধান! মানব-ইতিহাসের সব সাধনার চরম ফল, মুক্তাবৎ সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র একটী জীবন··· মানচিত্র-হীন মহাশূন্য···অনাবিষ্কৃত আত্মার মহাদেশ···একে একে পার হয়ে চলেন ··এ-পারে পৃথিবীর মানুষ যায় ক্রমশ সরে, দূর হতে দূরে···

বিচিত্র দেশ···বিচিত্র তার অভিজ্ঞতা···এক রহস্য-লোক থেকে আর এক রহস্য-লোকে···কি তীব্র তার আকর্ষণ···জগতের সব দ্রাক্ষা নিষ্পেষণ করেও সে-মাদকতার এক বিন্দুর তুলনা হয় না···

পথ দিয়ে চলে যায়, ভিখারিণী মেয়ে···রামকৃষ্ণ দেখেন যেন রাম-নির্বাসিতা চলেছে জনমদুখিনী সীতা···কে এক রাখাল-বালক পায়ে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছের তলায়, মনে পড়ে যায়, নন্দ-দুলাল বাঁশরী বয়ান···এতটুকু ইঙ্গিত, সামান্যতম ভঙ্গী নিমেষে টেনে নিয়ে

যায় তাঁকে দৃশ্য জগৎ থেকে অদৃশ্য আত্মার দেশে···চেতনার রাজ্য থেকে সমাধির অচেতন গভীরতায়···

"যে অবস্থায় সাধারণ জীবেরা পৌঁছুলে আর ফিরতে পারে না, একুশ দিন মাত্র শরীরটে থেকে শুক্‌নো পাতা যেমন গাছ থেকে ঝরে পড়ে, তেমনি পড়ে যায়···ছ'মাস সেখানে ছিলুম! কখন কোন্ দিক দিয়ে যে দিন আসতো, রাত যেতো তার ঠিকানাই হতো না। মরা মানুষের নাকে মুখে যেমন মাছি ঢোকে, তেমনি ঢুকতো, কিন্তু সাড় হতো না···চুলগুলো ধূলোয় ধূলোয় জটা পাকিয়ে গিয়েছিল···হয়ত অসাড়ে শৌচাদি হয়ে গিয়েছে, তারও হুঁস হয়নি! শরীরটে কি আর থাকতো! সেই সময়েই যেতো। তবে সেই সময় একজন সাধু এসেছিল। তার হাতে রুলের মত একগাছা লাঠি ছিল। সে অবস্থা দেখেই চিনেছিল; আর বুঝেছিল, এ-শরীরটে দিয়ে মা-র অনেক কাজ এখনও বাকি আছে; এটাকে রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে! তাই খাবার সময় খাবার এনে মেরে মেরে হুঁস আনবার চেষ্টা করতো···একটু হুঁস হচ্চে দেখেই মুখে খাবার গুঁজে দিত! এই রকমে কোনদিন একটু আধটু পেটে যেতো, কোনদিন যেতো না। এইভাবে ছ'মাস গেছে। তারপর এই অবস্থায় কতদিন পরে শুনতে পেলুম···মা বলছে···ওরে, ভাব-মুখে থাক···লোক-শিক্ষার জন্যে ভাব-মুখে থাক্···"

এইভাবে কঠোর সাধনার ফলে শরীর একদম ভেঙ্গে পড়লো। শরীর একটু সেরে উঠলে, ঠিক করলেন, নিজের বলতে আর কিছু রাখবেন না···সব জগজ্জননীর চরণে একান্তভাবে সমর্পণ করে দেবেন··· সব সংস্কার···বিচার বুদ্ধি···ভাল-মন্দ জ্ঞান···

এ দেহ বীণার মত তুলে দেবেন, তাঁর হাতে•••তাতে তাঁর যা খুশী বাজাবেন রাগিনী•••নিজের বলতে এতটুকু থাকবে না কোন বোধ•••

গুরু নেই•••মন্ত্র নেই•••তন্ত্র নেই•••শুধু নিজের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতা•••শুধু আমি আর আমার মন•••আর নেই কোন উপকরণ••• কোন যোগ, কোন যাগ•••মানুষ চলেছে•••নতুন দিগ্বিজয়ে•••নতুন সাধনায়•••

এক হাতে এক মুঠো মাটী•••আর হাতে টাকা•••সারাদিন ধরে গঙ্গার ধারে বসে নিজের মনকে বোঝান•••টাকাও যা•••মাটীও তা••• যতক্ষণ না পর্যন্ত সে জ্ঞান মনে বদ্ধমূল হলো, ততক্ষণ পর্যন্ত দিবারাত্র গঙ্গার তীরে বসে, একবার এ-হাত দেখেন, আর-একবার ও-হাত দেখেন, আর বলেন, টাকা-মাটী, মাটী-টাকা•••

লোকে এবার স্পষ্ট ধরে নিল, বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু সেই ক'দিনের একাগ্রতায় শুধু তাঁর মনে নয়, মনের জন্যে দেহেও এমন অনুভূতি জাগলো যে, টাকা ছুঁলে আপনা থেকে তাঁর হাতের আঙুল বেঁকে যেতো•••টাকা ছুঁলে তপ্ত কয়লা রাখার মত জ্বালা করতো•••

এমনিভাবে একে-একে একটী-একটী করে শৃঙ্খল নিজের হাতে খুলে খুলে তিনি এগিয়ে চলেন•••আজকের যুগের মানুষের জন্যে নতুন করে আত্মার অমর-রাজ্য আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে•••

সর্বশেষে জগজ্জননীর পায়ের তলায় পরিপূর্ণ শতদলের মত নিজেকে নিবেদন করে বলেন, এই মা, দিলাম ফুলের মত নিজেকে তোর রাঙা পায়ে অঞ্জলি•••এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান•••

এই নে তোর ধর্ম•••এই নে তোর অধর্ম•••এই নে তোর ভাল•••এই নে তোর মন্দ•••এই নে তোর পাপ•••আর এই নে তোর পুণ্য••• এই নে তোর যশ•••এই নে তোর অপযশ•••আমায় শুধু তোর শ্রীচরণে শুদ্ধা ভক্তি দে, দেখা দে•••*

৩০

মন্দিরে ঢুকে সেদিন আপনার মনে শিব-মহিম্ন-স্তোত্র পড়তে পড়তে হঠাৎ আত্মহারা হয়ে উঠলেন•••সেই অপূর্ব ছন্দ লালিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সেই মধুর আবেদনে, অন্তরের উচ্ছ্বসিত ভক্তি-স্রোতে কণ্ঠ-রোধ হয়ে এলো•••ছ'চোখ দিয়ে অনর্গল ঝরে পড়ে জল••• আর চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন, মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বলবো•••সে-কান্না অবিরাম ধারার মত বক্ষ ভাসিয়ে মাটীতে এসে পড়ে•••কালাকালজ্ঞান-হীন•••মন্দিরের কর্মচারীরা সবাই ছুটে এলো•••কে একজন বলে উঠলো, ভট্‌চাজের ও নিত্য পাগলামী !

---

* এখানে মনে রাখতে হবে, ঠাকুরের এই প্রার্থনা শুধু কথাগত উচ্ছ্বাস নয়। পাপ-পুণ্য, যশ-অপযশ, ইত্যাদি যে সব জিনিস সেদিন তিনি নাম করে করে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিয়েছিলেন, তার প্রত্যেকটী অনুভাব তিনি অন্তরে সাধনা করে সিদ্ধ হয়ে ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে তার একটীর জন্যেও সামান্যতম আকাঙ্ক্ষা তাঁর আর দেখা যায় নি। যা যাকে নিঃশেষে দিয়ে দিয়েছেন, সে-সম্বন্ধে কোন আকাঙ্ক্ষা আর তাঁর ছিল না। সেইজন্যে এই প্রার্থনায় তিনি বলেন নি, মা, এই নে তোর সত্য, এই নে তোর মিথ্যে। জগৎমাতার কাছে তিনি সত্য ত্যাগ করেন নি। তিনি নিজেই পরে সেইজন্যে বলেছিলেন, সত্য যদি ত্যাগ করি, তা'হলে এই যে সর্বস্ব দিয়ে দিলাম, এ সত্য রাখবো কি করে ?

কেউ বা তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বল্লেন, আজ কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি যেন…

হেসে আর একজন মন্তব্য করলেন, পাগলা শিবের মাথায় তো চড়ে বসবে না শেষকালে ?

সেদিন মথুরবাবু ঠাকুর বাড়ীতেই ছিলেন। মন্দিরে গোলমাল শুনে তিনি তাড়াতাড়ি চলে এলেন। মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে, ভেতরের সেই দৃশ্য দেখে, তিনি পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেলেন।

একজন কর্মচারী ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে বলে উঠলেন, ভট্চাজ এমনি থামবে না হুজুর…ওঁকে টেনে বার করে আনলে হয় না ?

সিংহ-বিক্রমে মথুরবাবু গর্জন করে উঠলেন, যার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে, সে গিয়ে ঠাকুরের গায়ে যেন হাত দেয় !

ভয়ে কর্মচারীরা ভীত মার্জারের মত কে কোথায় সরে পড়লো…

বহুক্ষণ পরে ঠাকুরের যখন জ্ঞান হলো, দেখেন মন্দিরে তিনি একা…আর মথুর প্রহরীর মত দরজায় দাঁড়িয়ে আছে !

লজ্জিত হয়ে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, যেন কত অপরাধী, বেসামাল কিছু করে ফেলেছি কি ?

মাটীতে লুটিয়ে প্রণাম করে মথুর বলেন, না বাবা, তুমি স্তব করছিলে, পাছে কেউ ব্যাঘাত করে বলে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

৩১

রাণী রাসমণি পরলোক গমন করেছেন। মথুরবাবু এখন সেই বিশাল জমিদারীর পরিচালক।

ঠাকুরকে বাড়ী নিয়ে যান, দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করেন। বাড়ীর পুরানো পুরোহিত হালদার বুড়ো হাড়ে হাড়ে জ্বলে যায়।

একদিন মথুরবাবু একটা কাগজ নিয়ে এসে ঠাকুরের পায়ের কাছে রাখলেন।

—বাবা, আমি যদি না থাকি তাই একটা জমিদারী আপনার নামে···

সাপে কামড়ালে মানুষ যেমন করে ওঠে, তেমনি ভাবে ঠাকুর আসন ছেড়ে উঠলেন, হাঁারে, এত কাণ্ডের পর তুই আমাকে বিষয়ী করতে চাস্?

মথুরবাবু লজ্জিত হয়ে কাগজটা ছিঁড়ে ফেল্লেন। হালদার বুড়ো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে দাঁড়িয়ে দেখে! রাগে তার সর্বশরীর জ্বলে যায়··· বহু চেষ্টা তন্ত্র-মন্ত্র করে বাবুকে একটু বশ করে আনছিলাম এমন সময় কোথা থেকে উড়ে বসে সব মাটী করে দিলে গা! নিশ্চয়ই কোন বশীকরণ মন্ত্র জানে···বাবুকে একেবারে মুঠোর মধ্যে করে নিয়েছে!

হালদার বুড়োর মনে শান্তি নেই। ঠাকুর জানবাজার বাড়ী এলেই সে ঘুর ঘুর করে, উদ্দেশ্য ঠাকুরকে ধরে অন্তত বশীকরণ মন্ত্রটা জেনে নেবে···বলবে না বিট্‌লে বামুন?

কিন্তু সুযোগ সুবিধে আর হয় না।

একদিন জানবাজার বাড়ীতে ঠাকুর দালানে রামকৃষ্ণ অর্ধবাহ্যদশায় আছেন···কাছে জন-প্রাণী কেউ নেই অবসর বুঝে হালদার বুড়ো শেয়ালের মত এগিয়ে এলো···তখন একটু একটু করে ঠাকুরের জ্ঞান ফিরে আসছে···

হালদার কাছে গিয়ে হাত দিয়ে ঠেলে বলে উঠলো, অ বামুন, বল্ না···বাবুকে কি করে হাত করলি···ঢঙ্ করে চুপ করে আছিস্ কেন? বল্, বশীকরণ মন্তরটা কি?

ঠাকুরের তখন কথা বলবার শক্তি নেই···চক্ষের দৃষ্টি স্তিমিত···

বারবার অনুরোধ করে যখন কোন সাড়াশব্দ পেলো না, তখন রেগে হালদার বুড়ো সজোরে পদাঘাত করে বলে উঠলো, যা শালা, না বল্লি তো বয়ে গেল!

বলেই পালিয়ে গেল।

ঠাকুরের জ্ঞান ফিরে আসতেই তিনি ভীত সন্ত্রস্ত চোখে চারদিক চেয়ে দেখেন, কেউ কোথায় আছে কি না! যদি কেউ হালদারের সেই কাণ্ড দেখে থাকে, তাহলে হয়ত বেচারার চাকরী যাবে, বড় কষ্টে পড়বে···

যখন বুঝতে পারলেন কেউ আর দেখেনি সে দৃশ্য, তখন আশ্বস্ত হলেন মনে।

৩২

নানা পথ নানা দিকে গিয়েছে চলে। পথিকের লোভের অন্ত নেই, সব পথ দিয়ে চলে সে দেখে, সব পথ গিয়ে মিশেছে, একই জায়গায়···

যখন মনে যে-ভাবের উদয় হয়, রামকৃষ্ণ সেইভাবে যান ডুবে··· অন্তরের একাগ্র নিষ্ঠায় সেই সময়ের মত তাঁর চেহারাও হয়ে যায় পরিবর্তিত···

শিশু হয়ে ডাকেন মাকে শিশুর মত হয়ে যায় সব ভঙ্গী··· ক্রিয়াকলাপ···দেখেন, বিশ্বজননী প্রসন্ন হাসি নিয়ে রয়েছেন হৃদয়-মন্দির আলো করে···

আনন্দে ভরে ওঠে মন, সে-আনন্দের মহা-পারাবারে মহাপদ্মের মত দোলে জীবন···

মথুরবাবুর বাড়ীতে চলেছে মাতৃপূজা···কুললক্ষ্মীরা একে একে এসে প্রতিমাকে আরতি করেন···সুবেশা, সুসজ্জিতা·· ধনীর গৃহলক্ষ্মী সব·

হঠাৎ মথুরবাবু দেখেন, তাঁর স্ত্রীর পাশে অপরিচিতা কে সুবেশা অপরূপ সুন্দরী নারী আরতি করছেন···ভাবাবেশে মুখ থেকে যেন

জ্যোতি ঝরে পড়ছে···যত মনে করতে চেষ্টা করেন, কিছুতেই মনে করতে পারেন না···অথচ কে যেন মনে বলে দিচ্ছে, সম্পূর্ণ অপরিচিতা নয় ঐ নারী !

আরতি শেষ হয়ে গেল···কুললক্ষ্মীরা আরতি শেষে অন্তঃপুরে ফিরে গেলেন···পূজোর কাজের মধ্যেও মথুরবাবুর মনে কিন্তু সেই অপরিচিতার মুখ জ্বলতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে অন্তঃপুরে গিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পাশে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আরতি করছিলেন, তাঁকে তো আগে দেখেছি বলে মনে হয় না !

স্ত্রী হেসে বলেন, দেখেছ বই কি ! তবে তুমিও চিনতে পারলে না।

মথুরবাবু যখন শুনলেন, নারী রূপে যাঁকে দেখেছেন, তিনি আর কেউ নন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ জগদম্বার সখীরূপে তিনি নিজের পুরুষ সত্ত্বা পর্যন্ত গিয়েছিলেন ভুলে···

৩৩

প্রত্যেক ধর্মমত, প্রত্যেক সাধন-রীতি নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে নিজের জীবনে অনুশীলন করে দেখলেন···দেখলেন সব পথ গিয়ে মিশেছে একই পরমা সিদ্ধিতে !

তখন সেই পরিপূর্ণ সিদ্ধির মহা-ঐশ্বর্য নিয়ে তিনি অপেক্ষায় রইলেন, অপেক্ষায় রইলেন তার জন্যে, যার মধ্যে দিয়ে জগতে সত্য হয়ে উঠবে তাঁর সাধনা।

তিনি জানতেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে, তাঁর লীলা-সহচরেরা।

দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে আকুলভাবে তিনি তাঁদের আগমন-প্রতীক্ষায় জেগে থাকেন।

হঠাৎ একদিন তাঁর এক গৃহী শিষ্য তাঁকে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। গান শুনতে তিনি ভালবাসেন। পাড়ার বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথ খুব ভাল গান গায়। নরেন্দ্রনাথের গান তাঁকে শোনাবেন।

সুরেন্দ্রনাথ অনেক সাধ্যসাধনা করে তরুণ নরেন্দ্রনাথকে ডেকে নিয়ে এলেন। নরেন্দ্রনাথ ইংরাজী শিক্ষিত তরুণ যুবা। গুরু-বেশী সাধু সন্ন্যাসীদের ওপর তাঁর জাত-ক্রোধ। নরেন্দ্রনাথের ধারণা তারা অধিকাংশই ভণ্ড। তাই তিনি আসতে চান নি। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরোধে অবশেষে তিনি রাজী হলেন।

গান যতক্ষণ হয় ঠাকুর একদৃষ্টিতে নরেনের দিকে চেয়ে থাকেন···

তাঁর মন বলে উঠে, এই তো সেই···এই তো সেই···তাঁর প্রতীক্ষার ধন···

গান শেষ হতেই নরেনের কাছে এগিয়ে গিয়ে তিনি ভাল করে তাঁর অঙ্গ-লক্ষণ সব দেখেন···সর্ব-অঙ্গে ভগবৎ লক্ষণ···দেখতে দেখতে তাঁর দেহে রোমাঞ্চ জেগে ওঠে···

আকুল আগ্রহে বলেন, হাঁরে, আসবি দক্ষিণেশ্বরে?

নরেন্দ্র নিস্পৃহ···

৩৪

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়ে একেশ্বরবাদ প্রচার করছেন ·

বাংলা দেশের সেই সময়কার তরুণদের মনের সামনে জীবন ও ধর্মের এক নতুন আদর্শ তিনি তুলে ধরেছেন সমাজকে ভেঙ্গে-চুরে এক নতুন জীবন্ত রূপ দিতে হবে··

নরেন্দ্রের শিক্ষিত মনে তার প্রভাব এসে পড়লো···

একদিন সমাজের ধর্মকার্য শেষ হয়ে গেলে নরেন্দ্র মহর্ষির সামনে উপস্থিত হলেন···

সরাসরি সোজা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?

মহর্ষির কাছেও স্পষ্ট করে সে-কথার উত্তর তিনি পেলেন না···

অন্তরের চাঞ্চল্য যত বাড়ে, বাইরেটা তত স্থির হয়ে আসে···

বিশ্বনাথ দত্ত পুত্রের ভাবান্তর দেখে দ্রুত বিবাহের আয়োজন করেন···

আয়োজন যখন প্রায়ই পেকে আসছে, সেই সময় নরেন্দ্র আপত্তি জানালেন, বিয়ে তিনি করবেন না···মাতাপিতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেও নয়···

তাঁদের পরমাত্মীয় রামচন্দ্র দত্ত নরেন্দ্রকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু যখন বুঝলেন কি নিদারুণ ধর্ম-পিপাসা থেকে নরেন্দ্র এই

কঠোর আদর্শ গ্রহণ করতে চলেছেন, তিনি আর বাধা দিলেন না, বল্লেন, তা হলে এখানে-সেখানে ঘুরে না বেড়িয়ে, দক্ষিণেশ্বরে যাও···রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে···

নরেন্দ্রের মনে পড়লো, সুরেন মিত্তিরের বাড়ী···সেই আধ-পাগলা লোকটা···কথা নেই, বার্তা নেই···তুই তুই করে বসলো···

সেই সঙ্গে মনে পড়লো, কলেজে হেষ্টি সাহেবের সেই অভিজ্ঞতা··· মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে···ঘুরে ফিরে খালি সেই আধ-পাগলা লোকটার চেহারা মনে পড়ে।

সুরেন মিত্তির বারবার করে অনুরোধ করেন, ঠাকুর নিজে তোমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন···

একদিন নরেন্দ্র ঠিক করলেন, দক্ষিণেশ্বরে যাবেন তিনি !

নরেন্দ্রকে দেখে ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না···

একটার পর একটা নরেন্দ্র গান গেয়ে যান, ঠাকুর তন্ময় হয়ে শোনেন। বিশেষ কিছু কথাবার্তা আর হয় না··

গান শেষ হয়ে গেলে যাবার জন্যে নরেন্দ্র উঠলেন, হঠাৎ ঠাকুর উঠে এসে তাঁর হাত ধরে টানতে টানতে একেবারে ঘরের বাইরে বারাণ্ডায় চলে এলেন···সেখান থেকে পাশের একটা ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে দিলেন···

বদ্ধঘরে দুজনে একা···

নরেন্দ্র অবাক···পাগলের একি খেয়াল আবার ··

চেয়ে দেখেন, পাগলের দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে···

নরেন্দ্র নিঃস্পন্দ···নির্বাক···

হঠাৎ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে পাগল বলে ওঠে, যেন কতকালের পরিচিত তিনি—হাঁরে, এমনি করে আমাকে বসিয়ে রাখতে হয়? এত নিষ্ঠুর তুই? বিষয়ী লোকের কথা শুনে শুনে কান যে ঝালা-পালা হয়ে গেল! প্রাণের কথা কইবো একটা লোকও পাই না···

নরেন্দ্রের বাক্‌শক্তি পর্যন্ত যেন চলে গেল···এ উন্মাদ বলে কি? আমি এটর্ণী বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র—আমাকে এ পাগল এসব কি বলে?

তাড়াতাড়ি খিল খুলে ঘর থেকে কিছু মিষ্টি নিয়ে এসে, নরেন্দ্রের মুখে তুলে দিয়ে বলে, আয়, নিজের হাতে খাইয়ে দিই!

নরেন্দ্র বলেন, দিন্ না আমার হাতে, বন্ধুরা সব রয়েছে, তাদের সঙ্গে একসঙ্গে খাব!

পাগল কাঁদতে কাঁদতে বলে, তারা খাবে'খন, তুই খা, আয়···

মা যেমন কোলের ছেলেকে খাইয়ে দেয়, তেমনি করে ঠাকুর নিজের হাতে নরেন্দ্রকে খাইয়ে দেন···

খাওয়ানো হয়ে গেলে বলেন, বল্, তুই একলা শিগ্‌গির আসবি আমার কাছে? বল্?

নরেন্দ্র বিহ্বলের মত বলেন, হাঁ !

ঘরে ফিরে এসে আবার সকলের সঙ্গে তাঁরা দু'জনে বসেন। নরেন্দ্রের মনে ঝড় উঠেছে…তুমুল ঝড়…কে এ উন্মাদ ? কেন তাঁর স্পর্শে তাঁর চৈতন্যের মর্মমূল পর্যন্ত এমন আলোড়িত হয়ে উঠছে ?

হঠাৎ নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?

এ প্রশ্ন নরেন্দ্র বহুবার বহুলোককে করেছেন…উত্তর কি হতে পারে, তা-ও তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই জীবনে প্রথম সেই উন্মাদের মুখে এই প্রশ্নের এমন সহজ উত্তর শুনলেন যে, তিনি নিজেই অবাক হয়ে গেলেন…

—ওরে, এই তোকে যেমন ঠিক সামনে দেখছি, তেমনি করে তাঁকে দেখেছি—ঠিক এমনি করেই তাঁকে দেখা যায়। তোর সঙ্গে যেমন কথা কইছি, ঠিক তেমনি করেই তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়…

নরেন্দ্র এ-উত্তর শুনবার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না…সহসা তাঁর মনে হলো, তাঁর পায়ের তলা থেকে যেন মাটী সরে গিয়েছে… চোখের সামনে জগতের বস্তু-পুঞ্জ যেন তার সীমা-রেখা সব হারিয়ে ফেলেছে…

বিহ্বলের মত নরেন্দ্র সে-রাত্রি বাড়ী ফিরে এলেন…

ওধারে দক্ষিণেশ্বরে, গঙ্গার তীরে, ঝাউতলায়, অন্ধকারে উন্মাদ ঘুরে বেড়ায় আর কাঁদে, ওরে তুই আয়, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না…আয়…

৩৬

বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র-মুখর ইতিহাসের মধ্যে ছুটী মানুষের এই মিলনের কথা···

আত্মার অমর-কাব্য···

নরেন্দ্রের চোখে ঘুম নেই···মুখে কথা নেই···সর্বদাই মনে হয় কে যেন টানছে, কে যেন ডাকছে, কে যেন মর্ম্মমূলে বসে কাঁদছে··

নরেন্দ্র প্রাণপণে নিজেকে ধরে রাখেন, বিজ্ঞানের সমস্ত শিক্ষা, পাশ্চাত্য দর্শনের সমস্ত মীমাংসা, সমস্ত এক করে তিনি নিজেকে বাঁধতে চেষ্টা করেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, সেই উন্মাদের কাছে আর যাবেন না···

কিন্তু একমাস চেষ্টার পর তিনি দেখেন, একদিন কখন নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি পায়ে হেঁটে চলেছেন উত্তর কলকাতা ছাড়িয়ে, বাগবাজার পেরিয়ে, বরানগর দিয়ে তিনি চলেছেন···

দক্ষিণেশ্বরের সেই কালীবাড়ী···

বাগানের ভেতর ঢুকলেন···ধীরে ধীরে মন্দিরের সোপানের ওপর উঠলেন···সেখান থেকে দেখা যায়—ঐ ঘর, তাঁকে টানছে···

তিনি নীরবে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন···

আজ আর ঘরে অন্য কেউ নেই···শুধু সেই উন্মাদ···

নরেন্দ্র নীরবে ঘরের এক পাশে বসলেন। অন্তরে আশঙ্কা, এইবার বুঝি পাগল আবার ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরবে, প্রলাপ বকবে···

কিন্তু উন্মাদ আজ স্থির···আকাশের মত সুগভীর···মুখে কি প্রশান্ত হাসি···চোখের দৃষ্টি পলকহীন, স্থির···যেন কালের যবনিকা ভেদ করে চলে গিয়েছে কালাতীত কোন্ মহা-ভবিষ্যতে···

এমন সময় দেখেন, উন্মাদ ধীরে ধীরে আসন থেকে উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে···নরেন্দ্রের কাছে এসেই ডান পা বাড়িয়ে উন্মাদ নরেন্দ্রকে স্পর্শ করলো···সে-স্পর্শে নিমেষে নরেন্দ্রের চৈতন্য পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেল···

নরেন্দ্রের স্পষ্ট বোধ হতে লাগলো, ঘরের দেয়ালগুলোর সঙ্গে ঘরের অন্য সমস্ত জিনিস ঘুরতে ঘুরতে যেন কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে··সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হতে ছুটে চলেছে···দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে নরেন্দ্রের মনে হলো, মরণ অতি নিকটে···সামলাতে না পেরে, চীৎকার করে উঠলেন, ওগো, তুমি আমায় একি করলে? আমার যে বাপ মা আছেন!

উন্মাদ অট্টহাস্য করে উঠলো···

নরেন্দ্রের কাছে বসে, বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লো, তবে এখন থাক্···একেবারে কাজ নেই···কাল হবে! *

* বিবেকানন্দের নিজের উক্তি থেকে

কি আশ্চর্য! হাতের স্পর্শে নরেন্দ্র আবার প্রকৃতিস্থ হলেন···চোখের সামনে বস্তুর যে মহাবিপর্যয় দেখছিলেন, নিমেষের মধ্যে তা অন্তর্হিত হয়ে গেল···তিনি দেখেন, সে-ঘর ঠিক তেমনি আছে···তিনি ঠিক তেমনি বসে আছেন···

নরেন্দ্রের সমস্ত অন্তর আলোড়িত করে প্রশ্ন জাগে, কে এ উন্মাদ, যে নিমেষের মধ্যে, শুধু একটী স্পর্শে, তাঁর সমস্ত জ্ঞান-বুদ্ধি, এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত মহাশূন্যে লীন করে দিল? কি এ শক্তি, যার স্পর্শে নিমেষের মধ্যে তাঁর অন্তরে যুগান্তর বিপর্যয় ঘটে গেল? একি ভোজবাজী···না যাদু? না, অন্য আর কিছু?

যে-রহস্যের নিরুদ্ধ দ্বারের কাছ থেকে সব মানুষের সব জিজ্ঞাসা বার বার প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে, সে মহা-রহস্যের দ্বার-উন্মোচন-মন্ত্র···তবে কি জানে শুধু এই উন্মাদ?

নরেন্দ্র স্থির করেন, যেমন করেই হোক্। জানতে হবে এই উন্মাদকে···

৩৭

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে বহু লোকের ভিড়···

ঠাকুর নরেন্দ্রকে আড়ালে ডেকে বল্লেন, বেড়াতে যাবি?

পাশেই ছিল যদু মল্লিকের বাগান-বাড়ী···ঠাকুরের জন্যে সে-বাড়ীর দ্বার অবারিত থাকতো সব সময়···

নরেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে ঠাকুর অনেকক্ষণ বেড়ালেন···তারপর বাগান-বাড়ীর একটী ঘরে গিয়ে বসলেন···

নরেন্দ্র পাশেই বসলেন···কিন্তু পাশ ফিরে দেখেন, ঠাকুর নিঃস্পন্দ, যেন পাথরের মূর্তি···

নরেন্দ্র বিস্মিত হয়ে সেই পাথরের মূর্তির দিকে চেয়ে থাকেন···যেন তার মধ্যে জীবনের কোন লক্ষণই নেই···

নরেন্দ্রের মনে ভয় হয়···গত দিনের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে···সেদিন অসতর্ক মুহূর্তে তাঁর মধ্যে যে-বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল, আজ যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্যে তিনি মনকে প্রস্তুত করতে লাগলেন···

কিন্তু হঠাৎ সেই পাথরের মূর্তি নড়ে উঠলো···এবং তাঁকে স্পর্শ করলেন···

স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের সমস্ত বাহ্যজ্ঞান লোপ পেলো···

যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখেন ঠাকুর তাঁর মাথা কোলে তুলে নিয়ে, বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন···

নরেন্দ্র প্রতিজ্ঞা করেন, এইভাবে এক যাদুকরের হাতে তিনি কিছুতেই তাঁর ব্যক্তিত্বকে নষ্ট হতে দেবেন না···

উন্মাদ এখন যাদুকর···

নরেন্দ্র যাদুকরের কাছে কিছুতেই যাবেন না···

৩৮

যাদুকরের মনে কিন্তু অসহ্য বিরহ জ্বালা…

নরেন্দ্র আসে না…ঠাকুর বালকের মত কাঁদেন, একে ওকে তাকে বলেন, হাঁ গা, তোমরা জান, নরেন কেমন আছে ?

গভীর রাত্রি…দক্ষিণেশ্বরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে…

ঠাকুরের চোখে ঘুম নেই…

পাশের ঘরেই তাঁর ভাগ্নে রামদয়াল ঘুমুচ্ছিলেন।

চুপি চুপি ঘরে ঢুকে তিনি রামদয়ালকে ডাকেন, ওগো তোমরা ঘুমুলে ?

রামদয়াল জেগে দেখেন, পবণের কাপড়খানি বগলে জড়িয়ে ধরে ঠাকুর কাঁদছেন…

সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়ে…কি ব্যাপার ?

কেঁদে ঠাকুর বলেন, ওগো, তোমরা কেউ একবার নরেনের কাছে যাও না…তাকে একটীবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেতে বোলো… তার জন্মে ভেতরটা যেন গামছা-নিংড়োনোর মত মোচড় দিচ্ছে…

সবাই আশ্বাস দেন…ভোর হলেই নরেনের কাছে যাবেন…

কিন্তু তাঁর মন বোঝে না…

সারারাত পাগলের মতন তিনি কেঁদে কেঁদে বেড়ান…

৩৯

বাড়ী-ঘর-দোর, আত্মীয়-স্বজন কিছুই আর ভাল লাগে না··· নরেন্দ্র বাড়ী ছেড়ে আলাদা একটা ঘর ভাড়া নিলেন···বাড়ীতে বোঝালেন, পড়ার চাপ পড়েছে···বাড়ীতে বড় অসুবিধা···

একলা ঘরে একা থাকেন···দিন কাটে চিন্তায়···রাত কাটে ধ্যানে···

নেশার মত পেয়ে বসে ধ্যান···

মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, তিনি কি ভুল পথে চলেছেন ?

শাস্ত্র খুলে দেখেন···অন্ধকার পথে চাই দীপশিখা···গুরু জ্বালিয়ে দেন সেই দীপশিখা···তাই গুরুর প্রয়োজন···

গুরুহীন সাধনা নিষ্ফল···

নরেন্দ্রের বিদ্রোহী মন অস্বীকার করে···নিজের ব্যক্তিত্ব অন্ধভাবে আর একজনের হাতে তুলে দিতে হবে ? না জেনে, না বুঝে, কোন কিছু গ্রহণ করবার জন্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি, চারিদিকে এই মেষ-শাবকের দল···তাদের সঙ্গে ঘাড় নীচু করে বাঁধা-পথে একসঙ্গে দল বেঁধে চলতে হবে ?

তিনি স্বতন্ত্র···তিনি একক···

বহুমূল্যে কেনা সেই স্বাতন্ত্র্য বিনা প্রশ্নে দিতে হবে বিলিয়ে ?

নরেন্দ্রের সন্দিগ্ধ মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে···

দক্ষিণেশ্বরে আসেন, যান···কিন্তু উন্মাদের কোন কথাতেই সায় দেন না···

ঠাকুর মিছরী তুলে রাখেন, মাখন তুলে রাখেন নরেন্দ্র খাবে বলে···

নরেন্দ্র ভর্ৎসনা করে···বিরক্ত হয়···বলে, আপনি সন্ন্যাসী মানুষ··· আমার জন্যে আপনার এত কান্না কেন ?

ঠাকুর হেসে উঠেন, বলেন, ওরে, তোকে যে আমার দরকার··· কত যে দরকার, মা তোকে একদিন দেবে বুঝিয়ে।

নরেন্দ্র আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন···নব-দীক্ষিত ব্রাহ্ম তিনি···নিরাকার পরব্রহ্ম ছাড়া কোন সাকার মূর্তি তিনি বিশ্বাস করেন না···

ঠাকুরকে শুনিয়ে বলেন, ও সব আপনার কল্পনার বিকার···

ভক্ত-শিষ্যরা কণ্টকিত হয়ে ওঠে, যুবকের কি স্পর্ধা···

তাদের থামিয়ে ঠাকুর বলেন, ওরে, ও যে জন্মেছে মানুষ শাসন করতে, ও যে ব্যাটা ছেলে···

নরেন্দ্রকে ডেকে বলেন, হাঁ রে, আমার মাকে যদি স্বীকার না করবি, তবে এখানে আসিস কেন ?

ঘাড় সোজা করে নরেন্দ্র উত্তর দেন, এখানে আসি বলে, আপনার মাকেও স্বীকার করতে হবে ?

হেসে ঠাকুর বলেন, ওরে একদিন মা মা করে তুই কাঁদবি !

নরেন্দ্র চমকে ওঠেন···কোথা থেকে কি বিশ্বাসে এই যাদুকর এত জোর দিয়ে কথা বলেন ?

এত সযত্নে গড়ে-তোলা তাঁর ব্যক্তিত্ব, এই উন্মাদ একটি স্পর্শে কাদার তালের মত চটকে যা খুশী তাই করে তোলে···একি যাদু, না, সবত্যাগী ভগবৎ-দ্রষ্টার আলোকসম্ভব বিভূতি ?

যাই হোক, বিনা পরীক্ষায়, বিনা প্রমাণে তিনি কিছুই গ্রহণ করবেন না···

৪০

ঠাকুর নরেন্দ্রের দিকে চেয়েই বোঝেন, কি ঝড় সেখানে বইছে··· নিজের বেদনা দিয়ে অনুভব করেন, আলোক ও অন্ধকারের সেই মহাদ্বন্দ্ব মানবের চিত্তাকাশে···

সে-খাণ্ডব-দহন-জ্বালা তিনি জানেন···

তিনি জানেন, তাকে এড়িয়ে গিয়ে মুক্তি নেই···

তাই নরেনকে দেখে একদিকে তাঁর মন বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে, আর একদিকে আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে···

সৃষ্টির সুপবিত্র বেদনায় প্রিয়তম শিষ্যের মধ্যে আজ তাঁরই আত্মা নব-জন্ম-গ্রহণ করছে··

সুনিপুণ ধাত্রীর মত তিনি ধীরে ধীরে সেই নব-জাতককে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছেন···

নরেন্দ্র যখন ভাবেন যে তিনি স্বাধীন, তিনি মুক্ত, তিনি স্বতন্ত্র, তিনি জানেন না কি কঠোর বন্ধনে সেই উন্মাদের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন···

অসীম বিস্তারের মধ্যে কি নিগূঢ় বন্ধন···

ক্রমশ সে-আকর্ষণে নরেন্দ্র বাঁধা পড়েন···সে প্রেমে দেবতা মানুষ হয়···

অন্য সব ভক্তদের মত নরেন্দ্রের মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, সেবা করতে।

ঠাকুর বাধা দেন—না, না, তোর এ-কাজ নয়, তোর পথ আলাদা।

৪১

একটু একটু করে শিক্ষা আরম্ভ হয়···

হঠাৎ একদিন বলেন, ওরে, আমাকে একটু অষ্টাবক্র সংহিতা পড়ে শোনা না···

অদ্বৈত-বেদান্তের গ্রন্থ···

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নরেন্দ্র পড়ে শোনান···পড়া শেষ হয়ে গেলে বলে ওঠেন, এ আমি মানি না, স্বীকার করি না···এ দর্শনে আর নাস্তিকতায় তফাৎ কোথায়? আমি স্রষ্টার সমান? আমি আর স্রষ্টা এক? এই ঘট, এই বাটী, এই গাছ, এ-ও ভগবান, আর আমিও ভগবান?

ঠাকুরের তখনঃ অর্ধ সমাধি অবস্থা···তার মধ্যে উঠে এসে সহসা তিনি নরেন্দ্রকে স্পর্শ করলেন···তিনি বুঝেছিলেন, প্রত্যক্ষ অনুভূতি ছাড়া নরেন্দ্রের অদ্বৈত চেতনা জাগবে না। সে জানতে চায় না, সে দেখতে চায়, সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে চায়। তাই মহাপুরুষ স্পর্শ দিয়ে সেই মহাশক্তি, যা না হলে বিশ্বরহস্যের পাঠোদ্ধার অসম্ভব, তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিলেন···

সে-স্পর্শে ক্ষণিকের মধ্যে ধ্যান-সিদ্ধ নরেন্দ্র সমাধিস্থ হয়ে গেলেন···

স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখলেন, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু নেই···

বহুক্ষণ ধরে সে মহা-দৃশ্য দেখেই চল্লেন···ভাবলেন, দেখি, কতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ভাবে থাকে···

সমাধি ভেঙ্গে গেল কিন্তু সে-ঘোর কাটলো না···

বাড়ীতে ফিরলেন, সেখানেও তাই···যা কিছু দেখেন, সবই ভগবান···সবই এক···

মা খেতে দিলেন···অন্ন···ব্যঞ্জন···যিনি পরিবেশন করছেন, যাকে পরিবেশন করা হচ্ছে, সবই এক···

দু'গ্রাস মুখে দিয়ে তিনি চুপ করে বসে থাকেন, মুখে আর অন্ন দিতে পারেন না···

মা বলে ওঠেন, বসে আছিস্ কেন রে, খা না।

মার কথায় হুঁস হওয়াতে আবার খেতে আরম্ভ করেন···

খেতে, শুতে, কলেজে যেতে, সব সময় সেই এক ভাব···বাতাসের মতন ঘিরে আছে সমগ্র বস্তুর জগতে সমস্ত ভেদ-রেখা সহসা কি করে মুছে গেল ?

রাস্তায় চলেছেন···গাড়ী আসছে, ঘাড়ে এসে পড়বে, ওটা গাড়ী · সে-বোধই নেই ·

খেতে খেতে কখন খাওয়া থেমে যেতো, সেখানে শুয়ে পড়তেন··· আবার খেতে বসতেন···

একটু একটু করে ঘোর ক্রমশ কমে আসে · বস্তুর জগৎ মনে হয় স্বপ্নময় দূরে···

পথ চলতে হেদুয়ার পুকুরের লোহার রেলিঙে মাথা ঠুকে দেখেন, ওটা রেলিঙ কি না · আঘাত লাগে কি না

ঘোর কেটে আসে ··নরেন্দ্রের মনে একটু একটু করে আনন্দ জাগে ··

প্রত্যক্ষ পাওয়ার আনন্দ ··অদ্বৈত জ্ঞানের আলো ··

৪২

গুরু আর শিষ্য ক্রমশ দূর থেকে পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসতে থাকেন···

একটু একটু করে নরেন্দ্রের মনের সন্দেহ কেটে যায়·· গুরু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়ে সে-সন্দেহ কাটিয়ে দেন···শিষ্য অনুভূতির কষ্টি-পাথরে আঁক কেটে দেখে নিয়ে তবে স্বীকার করে···দুটী মানুষ···পরস্পর পরস্পরকে জানার মধ্যে এতটুকু ফাঁক কোথাও নেই···

তবু সন্দিগ্ধ মনের পরীক্ষার অন্ত নেই···

গুরু নিজে শিষ্যদের ডেকে বলেন, ওরে, যাচাই করে নিবি··· স্যাকরা যেমন সোণা কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেয়, তেমনি করে গুরুকে যাচাই করে নিবি···

নরেন্দ্র প্রতিপদে যাচাই করেন···যত পরীক্ষা করেন, ততই তাঁর মনের স্বাতন্ত্র্য ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়···

সেই সঙ্গে বোঝেন, কি অপূর্ব কৌশলে সেই মায়াবী তাঁকে তার কাছে টেনে নিচ্ছে, তাঁর সব অহমিকা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চুরমার করে ফেলে দিচ্ছে···

একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখেন, ঘর খালি, ঠাকুর কলকাতায় গিয়েছেন···

হঠাৎ মনে হলো, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, দেখবো তুমি কেমন সর্বস্ব ত্যাগ করেছ!

এই ঠিক করে তাঁর বিছানার চাদরের তলায় একটা টাকা লুকিয়ে রেখে দেন···

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ফিরে এলেন···বিছানায় বসলেন, কিন্তু বসতে না বসতে বালকের মত বেদনায় চীৎকার করে উঠলেন, ওরে, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, চাদর তুলে দেখ্···

নরেন্দ্র নির্বাক বিস্ময়ে ঘরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন·· দু'চোখ তাঁর জলে ভরে এলো···ধীরে ধীরে এসে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলেন···

নদী সাগরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল···

৪৩

সে-কথা জগতে কেউ জানে না—জানে শুধু গুরু, আর জানে শিষ্য···কখন এলো সে মহা-লগ্ন, কখন উঠলো ফুটে হৃদয়কমল সহস্রদল···

গুরু শিষ্যতে হলো সম্পূর্ণ···

শিষ্য গুরুতে হলো লীন, জলে জল যেমন হয় লীন··

একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রকে নিভৃতে ডেকে বলেন, দেখ্, মার দয়ায় আমার অনেক বিভূতি আছে—ইচ্ছে করলেই অনেক কিছু করতে পারি, কিন্তু আমি নেংটা, আমার কাপড়ের কোন ঠিক থাকে না—আমি সে-সব নিয়ে কি করবো বল্; মা বলেছে, তোকে মার দরকার··· জগতে তোকে অনেক কাজ করতে হবে, তুই চাস্ তো বল্, এই মুহূর্তে তোকে আমি সেগুলো দিয়ে বাঁচি।

জন্মজন্মান্তরের তপস্যার ফল··দেব-দুর্লভ মায়া-শক্তি যার এক কণা পেলে মানুষ ধন্য হয়ে যায়···আজ শুধু চাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে··· চাইলেই পাওয়া যায়···অনায়াসে, বিনা শ্রমে···

কিন্তু নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, সে-সব শক্তি নিয়ে, কি আমার ঈশ্বর-লাভ সহজ হবে?

ঠাকুর বলেন, না···ঈশ্বরলাভ হলে, যখন কাজ করতে নামবি, তখন অনেক কাজে লাগবে···

নরেন্দ্র বলেন, না, তবে ও সব আমার চাই না···আশীর্বাদ করুন, আমার ঈশ্বর-লাভ হোক্···

গুরুর মন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, ওরে, সব ত্যাগ করে আজ তুই সব পেলি···

৪৪

তবু ঝড় থামে না···

একদিকে ঝড় কমে···আর একদিকে ওঠে··

হঠাৎ বিশ্বনাথ দত্ত পরলোক গমন করলেন!··

সমস্ত সংসার নরেন্দ্রের ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো···

এত দিন যাকে অস্বীকার করে পালিয়ে বেড়িয়ে ছিলেন, আজ সে শত নাগপাশে তাঁকে বেঁধে ফেল্লো ··

পিতা কিছুই রেখে যেতে পারেন নি···পৈত্রিক ভিটাটুকু পর্যন্ত আত্মীয়রা দখল করে নিল···

মাসে মাত্র ত্রিশ টাকা ভরসা। সেই ত্রিশ টাকায় একটা বিরাট সংসার···

তারপর পিতৃ-ঋণ···পাওনাদারেরা পথ আগলে দাঁড়ালো···

অনাহারে কলকাতার রাস্তায় অফিস থেকে অফিসে ঘুরে বেড়ান··· সামান্য চাকরী, কেউ দেয় না···

জনক-জননী

কিছু দিন আগেও যে-সব বন্ধুরা যেচে এসে খবর নিতো, সেধে গিয়েও তাদের দেখা পাওয়া যায় না···

নিজের অনাহার সহ্য করা যায়, কিন্তু মা, ভাই, বোন অনাহারে থাকবে এ চিন্তা নরেন্দ্রকে পুড়িয়ে ফেলে···

সকাল হলেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান···মা কোন-রকমে এক মুঠো সিদ্ধ করে ডাকেন, খেয়ে যা···

নরেন্দ্র ওজুহাত দেখান, নেমন্তন্ন আছে। মা মনে মনে জানেন, তাঁর অংশটুকু অন্তত একজনেরও উপবাস দূর করবে···

এক পথ থেকে আর এক পথে···তৃষ্ণায় যখন গলা শুকিয়ে যায়, রাস্তার কলের জল অঞ্জলি ভরে খান···

মুক্তি-কামী সন্ন্যাসী···দারিদ্র্য-বিষ-জ্বালা তাঁরও অন্তর শুকনো খড়ের মতন পুড়িয়ে দেয়···

রাত্রিবেলায় অশ্রু-ভার রোধ করে ডাকেন, ভগবান, ভগবান···

একদিন বিরক্ত হয়ে মা বলেন, পেটে ভাত নেই, ভগবান, ভগবান··· ছেলেবেলা থেকে ঐ সব করে মাটী হলো—ভগবান তো সব করলেন!

বিষধর কালসর্প মাথা তুলে ওঠে! তবে কি সত্যই ভগবান নেই? যদি থাকেন, কেন এ দারিদ্র্য? কেন এ অসামঞ্জস্য?

নরেন্দ্র নিজের মনের জ্বালা নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে পর্যন্ত যান না···

অনাহার অভ্যাস হয়ে আসে···

একদিন অনাহারে বর্ষার জলে ভিজে ভিজে, শরীর অবসন্ন হয়ে পড়লো···চলতে আর পারলেন না—এক বাড়ীর রকে মূর্চ্ছিত হয়ে শুয়ে পড়লেন···

মূর্চ্ছাভঙ্গে ঠিক করলেন, গুরুকে প্রণাম করে, কাউকে কিছু না বলে সংসার ছেড়ে চলে যাবেন···

শুনলেন, কলকাতায় এক ভক্ত-বাড়ীতে ঠাকুর এসেছেন···

অযাচিত ভাবে নরেন্দ্র সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন···কাউকে কিছু না বলে নীরবে এক কোণে বসে রইলেন···

সভা ভঙ্গ হলে গুরুকে প্রণাম করলেন।

হঠাৎ ঠাকুর বলে উঠলেন, আজ তোকে ছাড়বো না···আমি সঙ্গে ধরে নিয়ে যাব···

নরেন্দ্র বহু প্রতিবাদ করলেন···অনেক ওজর-আপত্তি দেখালেন···

ঠাকুর কোন কথাই শুনলেন না, জোর করে গাড়ীতে নিয়ে তুল্লেন···

গাড়ীতে দু'জনেই নীরব···

দক্ষিণেশ্বরে ঘরে অনেক লোক···ঠাকুর ঘরে এসেই ভাব-ঘোরে চুপ করে বসে আছেন···একে একে লোক চলে যাচ্ছে···

কিছুক্ষণ পরে নরেনকে ডেকে নিয়ে বারাণ্ডায় এলেন···কোন কথা না বলে, তাঁর দু'হাত ধরে, হঠাৎ গেয়ে উঠলেন,

কথা কহিতে ডরাই,
না কহিতেও ডরাই,
আমার মনে সন্দ হয়···
বুঝি তোমায় হারাই হা-রাই !

বিস্মিত বিমুগ্ধ নরেন চেয়ে দেখেন, ঠাকুরের দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে···

নরেন্দ্র বুঝলেন, অন্তর থেকে অন্তরযামী তাঁর অন্তরের বেদনার কথা বুঝেছেন···আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে ছোট ছেলের মতন কেঁদে গুরুর বুকে লুটিয়ে পড়লেন···

ধীরে ধীরে শত-জননীর স্নেহে, আর্ত শিষ্যের কানে কানে বলেন, জানি রে জানি, সংসার তোকে ধরে রাখতে পারবে না···মার কাজে তোর জীবন যে উৎসর্গ করা···তবে, যেক'টা দিন আমি আছি, আমাকে ছেড়ে যাস্ নি···

আজ বহুদূর থেকে, এক অসম্ভব অবিশ্বাসী যুগের এক শিশু কল্পনায় সেই মহাদৃশ্য দেখছে···

দেহাতীত সেই দুই মনের অপূর্ব মিলন···

মানব-ইতিহাসের সেই সুদুর্লভ মহা-লগ্ন···

৪৫

পিঞ্জর ভেঙ্গে যে-পাখি বেরিয়েছিল নীলাকাশে, সে এলো আবার ফিরে পিঞ্জরে…

নরেন্দ্রের সংসার ত্যাগ করা হলো না…

যে সর্বত্যাগী, যার সংসারের কোন বালাই নেই, সেই সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীই তাঁকে ফিরিয়ে আনলো সংসারে…

কেন? সর্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসীর এ কি খেয়াল?

পরের দিন দক্ষিণেশ্বর থেকে নরেন্দ্র আবার বাড়ীতে ফিরলেন…

মনে শুধু এক চিন্তা, হে গুরু, সংসার থেকে সবাইকে তুমি টেনে আনো, আমাকে কেন শুধু সংসারে রাখলে আটকে?

সংসার, দারিদ্র্য, অপমান, লাঞ্ছনা, দু'মুঠো অন্নের জন্য উদয়াস্ত হাহাকার, সব দেখা দেয় একে একে…

ঘুরতে ঘুরতে এক এটর্ণীর অফিসে কিছু কাজ জুটলো, মাঝে মাঝে।

সেই সঙ্গে জুটলো এক প্রকাশক, বই অনুবাদ করার কাজ… অতি সামান্য পারিশ্রমিক।

তার ওপর স্থায়ী কিছু নয়, স্থিরতাও কিছু নেই।

কোন রকমে দু'দিন চলে আবার থেমে যায়…আসে অর্ধাশন, উপবাস…উদরের আধিপত্য…

অন্তর জুড়ে জাগে আশঙ্কা···জীবনের অমৃত-দান শুধু দু'মুঠো অন্নের সংস্থানে যাবে নিঃশেষে হারিয়ে ?

নামে রাত্রি। ছায়াময়ী অন্তরের অন্তহীন তামসী রাত্রি। যার নিঃসীম অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে এমনি কত লক্ষ প্রাণের জ্বলন্ত দীপশিখা···নিশ্চিহ্ন···

সে আঁধারে হয়ে যেতে হবে একাকার ?

হঠাৎ মনে পড়ে, ঠাকুরের কথা তো মা শোনেন। ঠাকুর যদি আমার হয়ে মার কাছ থেকে চেয়ে নেন্···চেয়ে নিলেই তো তিনি পাবেন, আমার মা-বোনের অন্নকষ্ট থাকবে না···তা হলে তো সব সমস্যা মিটে যায় !

আমার জন্যে ঠাকুর নিশ্চয় তা চাইবেন !

একেবারে সোজা দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুরের সামনে···

—আপনি একবার আমার হয়ে মাকে বলুন ! আমি নিজের জন্যে কিছু চাই না···আমার মা, ভাই আর বোনেদের যেন অন্নকষ্ট না হয় !

ঠাকুর হেসে বলেন, বেশ তো, তুই নিজে চেয়ে দেখ্ ! তোরও তো মা !

বিহ্বল নরেন্দ্র বলেন, মাকে তো আমি জানি না···

—সেই জন্যেই তোর এত কষ্ট রে !

—আমি কোন কথা শুনবো না, আমার হয়ে আপনাকে আজ বলতেই হবে !

—মাকে বলতে গেলে মা শুনবে কেন? তুই যে মাকে মানিস্ না। আর আমি যে মার কাছে কথা দিয়েছি, ওসব জিনিষ মার কাছে চাইবো না···চাইতে পারি না···তার চেয়ে এক কাজ কর না কেন?

—কি?

—আজ মঙ্গলবার। আজ রাত্রিতে তুই একা কালী ঘরে যা··মাকে গিয়ে প্রণাম কর্···মা বলে ডাক্···আমি বলছি, মার কাছে যা চাইবি, তাই পাবি···

৪৬

নরেন্দ্রের মন আশায় উদ্বেল হয়ে ওঠে···তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়, ঠাকুর যখন বলেছেন, তখন তা সত্য হবেই···

নিদারুণ উৎকণ্ঠা···আগ্রহ···দেহ-মন বেতস-লতার মত বেপথু··কখন রাত্রি আসবে···কখন সেই মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন···

আজ সব সন্দেহের হবে নিরসন। ভক্ত ও ভগবান দাঁড়াবে মুখোমুখি···বিশ্ব-সংসার, শাস্ত্র, পুঁথি-পত্র, আস্তি-নাস্তির দ্বন্দ্ব, সব থাকবে বাইরে পড়ে···

অনুভূতি···প্রত্যক্ষ অনুভূতি···

মার স্তন থেকে স্তনসুধা পান···

অমৃতরস···

পাষাণী হবে বরদাত্রী··অন্নপূর্ণা নিজের হাতে তুলে দেবে অন্ন···জীবনের পরমান্ন!

আশায়, আনন্দে, উৎকণ্ঠায় আসে মধ্য-রাত্রি...

ঠাকুর বলেন, এবার নিশুতি হয়েছে...যা...

নরেন্দ্র শ্রীমন্দিরের দিকে চলেন...কোন হুঁস নেই কোথা দিয়ে চলেছেন...সব অঙ্গে যেন গাঢ় নেশা...চলতে পা টলে টলে পড়ে যায়...

অন্তরে শুধু এক চিন্তা...এতদিন পরে কি সত্যি দেখা পাবো ? ঐ মাটীর পুতুল...ওকি সত্যি পুতুল নয় ? ওকি সত্যিই বিশ্বজননী...চিন্ময়ী...সর্বশক্তি-মূলাধার ?

ভাবতে ভাবতে কখন মন্দিরের ভেতরে ঢুকেছেন...প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়েছেন...

দেখেন বিশ্ব-ভুবন আলো করে, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বের বরদাত্রী...আদ্যাশক্তি...

ভুলে গেলেন সংসারের কথা...তুচ্ছ দুঃখের কথা...অনটনের ব্যথা...

কেঁদে বলে উঠলেন, মাগো, বিবেক দাও...ভক্তি দাও...এমনি যেন অবাধ পাই তোর দর্শন !

টলতে টলতে ফিরে এলেন গুরুর কাছে...আনন্দে সর্ব-শরীর রোমাঞ্চিত...একি দিব্য-অনুভূতি...একি দর্শন !

হেসে ঠাকুর বলেন, কিরে, মাকে বল্লি সংসারের কষ্ট দূর করতে ?

ঠাকুরের প্রশ্ন শুনে নরেন্দ্র চমকে ওঠেন...মনে পড়ে সংসারের কথা...বলেন...

—ভুলে গেলাম। চাইতে তো পারলাম না…কি হবে ?

—যা যা, ফের যা। ভুলে গেলে চলবে কেন ?

নরেন্দ্র আবার যান, কিন্তু মার সামনে গিয়ে আর বলতে পারেন না। শুধু বলেন, মাগো, জ্ঞান দাও…ভক্তি দাও

বিহ্বল হয়ে ঠাকুরের কাছে ফিরে আসেন…

—কিরে, বলেছিস্ তো ?

নরেন্দ্র বলেন, বলবো বলে ঠিক করে যাই কিন্তু সামনে গিয়ে কি জানি কি হয় কিছুতেই বলতে পারি না…কি যেন নেশার মত আচ্ছন্ন করে বসে…কি হবে ?

—দূর ছোঁড়া, একটু সামলে নিয়ে কাজের কথাটা বলতে পারলি না…পারিস্ তো আর একবার চেষ্টা করে দেখ্

নরেন্দ্র আবার ফিরে চলেন…এবার প্রতিজ্ঞা করেন, ঠিক বলবেন। কিন্তু মন্দিরে পা দিতেই তাঁর মনে হলো, একি লজ্জা…যিনি বিশ্বের বরদাত্রী, তাঁর কাছে চাইবো কিনা এক মুঠো অন্ন ? একি দীনতা।

মার সামনে লুটিয়ে পড়ে নরেন্দ্র বলেন, মাগো, অন্য কিছু আর চাই না তুমি দাও জ্ঞান…দাও ভক্তি

ফেরবার মুখে মনে হলো, তিন তিনবার চেষ্টা করেও, তাঁর মুখ থেকে ও-কথা বেরুলো না কেন ? এ নিশ্চয় ঠাকুরের কারসাজী !

ধরে বসলেন ঠাকুরকে—এ নিশ্চয় আপনার খেলা···কিন্তু তা বলে আপনাকে আমি ছাড়ছি না···আপনি বলুন, আমার মা-বোনেদের অন্নকষ্ট থাকবে না—তা হলেই হবে!

নরেন্দ্রকে আনন্দে আলিঙ্গন করে ঠাকুর অগত্যা বলেন, আমি বলছি তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না!

আনন্দে নরেন্দ্র বালকের মত নৃত্য করে ওঠেন···সারা রাত ধরে একা গান গেয়ে চলেন—

"তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী
তুমিই জগদ্ধাত্রী মাগো···
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী
সদাশিবের মনোহরা···"

ভোরবেলা ক্লান্ত দুরন্ত শিশুর মত মন্দিরের চাতালে ঘুমিয়ে পড়েন।

৪৭

এমনি ধারা চলে গুরু-শিষ্যের পরিচয়···

ফুল যেমন আপনা থেকে ফুটে ওঠে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন, নরেনের মন তেমনি আপনা থেকে ফুটে উঠুক···

বলতেন, ও যে সহস্র-দল কমল!

নিবিড় ধ্যানে নরেন্দ্র ডুব দিলেন···সারারাত্রি সংসারে যখন সবাই ঘুমে অচেতন, নরেন্দ্র ধ্যানে আত্মহারা···

ভোরবেলা শহরের কারখানাগুলো থেকে কলের বাঁশী বেজে ওঠে··· সে-শব্দে ধ্যান ভেঙ্গে যায়···ব্যাঘাত হয়···

শিষ্য গুরুকে এসে জানালেন···এর কি প্রতিকার ?

সর্ব-সাধন-সিদ্ধ গুরু উপদেশ দেন, ঐ কলের আওয়াজের ওপরই মন স্থির কর !

নিষ্ঠাবান শিষ্য তাই করে···

প্রতিদিন বাঁশী বাজে···কিন্তু ব্যাঘাত আর হয় না···

যে-মন একদিন বিশ্বজয় করেছিল, এমনিভাবে সে-মন গড়ে উঠেছিল···বিশুদ্ধ দেহে দুস্কর তপস্যার মধ্য দিয়ে···

ধ্যান করতে করতে অনেক সময় দেখতেন, নিবিড় ধ্যানের মধ্যেও দেহ-অনুভূতি রয়েছে···

তবে যে শাস্ত্র বলে, মনের আছে সে-শক্তি, দেহ-অনুভূতিকে যা দিতে পারে একেবারে বিলুপ্ত করে···?

আবার শরণাপন্ন হন গুরুর···

গুরু নখ দিয়ে দুই ভ্রূর মাঝখানে আঘাত করে বলেন, ঐ আঘাতের ওপর চিত্তস্থাপনা কর্ !

শিষ্য তাই করেন···

জাগে দেহজয়ী বীর সন্ন্যাসী···

আত্মসর্বস্ব অবিশ্বাসী যুগের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদস্বরূপ জাগে ভারতের দিব্য-সাধনার মূর্ত বিগ্রহ···নূতন মানব···

৪৮

নূতন মানব, বিশ্ব রয়েছে তোমার জন্য অপেক্ষা করে! নূতন সন্ন্যাসী, বিশ্বের আছে নূতন দাবী তোমার ওপর···

সে-কথা জানে না তখন কেউ-ই··জানে না নূতন মানব নিজে!

ধ্যানের আছে তীব্র মাদকতা···যে-মাদকতার নেই জগতে তুলনা···

নরেন্দ্রের মনে পেয়ে বসে সে-মাদকতা···সমাধি···মুক্তি···

শঙ্কিত হয়ে ওঠে গুরু···নূতন মানবের স্রষ্টা···

সেদিন জগতে একমাত্র তিনিই জানতেন, কি মহা-ভবিতব্যতা অপেক্ষা করে আছে ঐ ধ্যানসর্বস্ব শিষ্যটির জন্যে···

ধ্যানের আত্মবিলুপ্তির মাদকতা থেকে ফেরাতে হবে নূতন মানবকে··· নূতন সন্ন্যাসীকে দীক্ষিত করতে হবে নূতন কর্ম-সন্ন্যাসে···

অরণ্য নয়, জগৎ চায়, নূতন সন্ন্যাসীকে···

সেদিন সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, বাংলার এক নগণ্য গণ্ডগ্রামে···অশিক্ষিত এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত, আপনার অসাধারণ সাধনার

দিব্য-জ্যোতিতে দেখেছিলেন, নিখিল মানবের, মুক্তি-স্বপ্নকে···বুঝেছিলেন ধর্মকে দিতে হবে নূতন সংজ্ঞা, সুনিশ্চিত অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করতে হবে মানুষের বলদর্পী বাহ্যির সবস্ব সভ্যতাকে···

তাই দেব-দুর্লভ মায়াশক্তির অধিকারী হয়েও, তিনি সেদিন দীন ভিক্ষুকের মত অপেক্ষা করে ছিলেন, আর এক মহামানবের জন্যে···যে নিজের বিরাট-স্কন্ধে বিশ্বের কর্ম-ভার বহন করতে পারবে···

তিনি দেখেছিলেন, সে মহামানব, তাঁরই শিষ্য···আত্মমুক্তির স্বপ্ন থেকে ফেরাতে হবে তার মনকে বিশ্বের মুক্তির পথে···

তাই তাঁর শঙ্কা···নরেন্দ্রের ধ্যান-মাদকতা দেখে···

৪৯

কথা হচ্ছিল বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে···

ঠাকুর বলছিলেন, বৈষ্ণব ধর্মের তিনটী প্রধান বিষয়, নামে রুচি, জীবে দয়া আর বৈষ্ণব পূজন···

ব্যাখ্যা করে শিষ্যদের বোঝাচ্ছিলেন সব জীবকে ঈশ্বরের অংশ জেনে দয়া করা···

কিন্তু হঠাৎ তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন···সমাধিস্থ···বহুক্ষণ পরে সমাধি ভাঙ্গলে তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, জীবে দয়া···তুই কীটানুকীট, জীবে দয়া করবার তুই কে? ওরে জীবে দয়া নয়··· দয়া নয়···শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!

নরেন্দ্রের মনে যেন দপ্ করে অগ্নি-শিখা জ্বলে ওঠে…সেবা… আর্ত্ত মানবতার সেবা…

পরমহংসদেবের অন্য শিষ্যরাও সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন… কিন্তু তাঁরা বুঝলেন না, কেন তিনি সে কথা বল্লেন আর সে কথার তাৎপর্যই বা কি?

কিন্তু যাঁর জন্যে সে কথা বলা…তাঁর মনে তীব্র আলোড়ন জেগে উঠলো…

বেদান্ত কি মানুষকে মানুষের সংসার থেকে টেনে বনে নিয়ে যাবে?

বনের বেদান্ত কি ঘরে আনা যায় না?

নিশ্চয়ই যায়…গুরু তো তাই বল্লেন…

জীব ও জগৎ…তাঁরই একান্ত প্রকাশ…

সম্মুখে কোটী কোটী নারায়ণ ক্ষুধার্ত আর্ত মূর্তিতে আমারই জীবনকে কেন্দ্র করে ঘুরছে…তাদের ছেড়ে কোথায় খুঁজছি ঈশ্বর?

বেদান্তের নতুন রূপ নরেন্দ্রের চোখের সামনে ফুটে ওঠে…

৫০

কিন্তু তরুণ সন্ন্যাসীর তাতে মন ভরে না…তৃষ্ণা ওঠে বেড়ে… প্রেম যায় স্পর্শ…তত্ত্ব নয়…

যে স্পর্শে সব চেতনা যাবে লুপ্ত হয়ে…ভাবের অতল গভীরে ভক্ত আর ভগবান যাবে একাকার হয়ে…

কোথায় সে ভাব-সমাধি ? কতদূরে সে দিব্য-অনুভূতি ? যার দিব্য প্রকাশ দেখেছেন গুরুর মধ্যে ?

নরেন্দ্র আরো গভীর ভাবে, নিবিড় ভাবে মেতে ওঠেন ধ্যান-সাধনায়···

দেখেন, ঠাকুরের কোন কোন শিষ্য সেই দিব্য-অনুরাগে নাম-স্মরণেই বিবশ হয়ে পড়েন···যেন দেহে প্রাণ নেই···

নরেন্দ্রের মনে শঙ্কা জাগে, কই, আমার তো ওরকম হয় না ?

থাকতে না পেরে গুরুকে নীরবে মনের বেদনা জানান···

গুরু আশ্বাস দিয়ে বলেন, ওরে এতে দুঃখ পাবার কি আছে ? হাতী যখন ছোট পুকুরে এসে পড়ে, তখন পুকুরের জল তোলপাড় হয়ে উঠে··কিন্তু যখন গঙ্গায় নামে তখন জল যেমন থির, তেমনি থিরই থাকে···যাদের দেখে তুই দুঃখ করিস্ ওরা হলো সেই ছোট্ট পুকুর···বিরাটের একটু ছোঁয়া লেগে, ওরা তাই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে ···তুই হলি যে নদী, বিরাট সাগর···

তবু মন বোঝে না···

৫৯

সংসার ব্যঙ্গ করে···বন্ধুরা সন্দেহ করে···

একদিন নরেন্দ্রের কয়েক জন বন্ধু গোপনে ষড়যন্ত্র করে···

সকলে এসে নরেন্দ্রকে ধরে, তাদের সঙ্গে বাগানে যেতে হবে···

সরল মনে নরেন্দ্র রাজী হয়···

সব বন্ধু মিলে গাড়ী করে কলকাতা থেকে কিছু দূরে এক বাগান-বাড়ীতে এসে হাজির হলেন···

খাওয়া-দাওয়া···গান-বাজনা প্রচুর হলো।

নরেন্দ্র একটার পর একটা গান গেয়ে যান—বন্ধুরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে শোনেন···

হঠাৎ একজন বলে ওঠে, নরেন, তুই একটু জিরো···

নরেন্দ্র ক্লান্তও হয়ে পড়েছিলেন···

—বারান্দার ঐ ঘরে তুই একটু বিশ্রাম কর গে যা···তোর দরকার···

সত্যই বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ হওয়ায় নরেন্দ্র উঠে বারান্দার ঘরে যান।

তার কিছুক্ষণ পরেই দেখেন, সেই ঘরে এক তরুণী নারী··· সুন্দরী, সুবেশা তাঁর কাছে এসে বসলো··

নরেন্দ্র বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না···সহজভাবে সহোদরা-জ্ঞানে তরুণীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন—কে সে? কি পরিচয়?

তরুণী তার জীবনের নানা কাহিনী বলে যায়···কত দুঃখ···কত যন্ত্রনা···কত অভাব···

নরেন্দ্রের মন অসহায় নারীর সেই করুণ কাহিনীতে ব্যথিত হয়ে ওঠে···

সেই সুযোগে তরুণী তাঁর সঙ্গ কামনার ইঙ্গিত জানায়···

সর্প-আহত ব্যক্তিব মত নবেন্দ্র উঠে দাঁড়ান, বলেন, ক্ষমা করবেন··· আমি চললাম···আপনার কথা শুনে সত্যিই আমি ব্যথিত···যে জীবন যাপন করছেন, তা যদি মনে প্রাণে বুঝে থাকেন যে অন্যায় ও অস্বাভাবিক, তা হলে একদিন হয় তো তাব হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন···

এই বলে নরেন্দ্র দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন···

দরজার সামনে বন্ধুদের দেখে বলেন, একজন সন্ন্যাসীকে নিয়ে এ রকম খেলা করা কি ঠিক ভাই !

৫২

যত দিন যায় গুরু শিষ্যকে তত আঁকড়ে ধরেন···

কিন্তু সে-আকর্ষণের মধ্যে কোন বন্ধন নেই···সব শিষ্যের মধ্যে তার জাগ্রত দৃষ্টি, নরেন্দ্রের উপর সদা-সর্বদা···

শত-জীবন সাধনা করে যা পাওয়া যায় না সেই অপূর্ব দৈবশক্তি, তিনি আজ বহু সাধনার ফলে, বহু বেদনার ফলে অর্জন করেছেন··· তিনি জানেন সেইটুকুই তাঁর আয়ু···তাঁর ভবিতব্যতা···

তাই গঙ্গার তীরে, সেই অপরূপ ঐশ্বর্য্য নিয়ে, কৃপণের মত নিজেকে লুকিয়ে, তিনি অপেক্ষায় ছিলেন, কখন আসবে তাঁর আত্মার উত্তরাধিকারী···যার হাতে তাঁর সঞ্চিত সব ধন তুলে দিয়ে তিনি হবেন রিক্ততায় সম্পূর্ণ···

ধ্যানের তৃতীয় নয়নে তিনি দেখেছিলেন, নরেন্দ্র তাঁর সেই উত্তরাধিকারী…ভারতের পুঞ্জিভূত তপস্যার ফল যার হাতে তাঁকে তুলে দিয়ে যেতে হবে…জগতের কল্যাণে…সমগ্র মানবতার কল্যাণে…

তাই তিলে তিলে, দিনে দিনে, নিজেকে রিক্ত করে, সেই মহাদানের যোগ্য করে শিষ্যকে গড়ে তুলছিলেন…

এ দেওয়া-নেওয়ার তুলনা মানুষের লেখা ইতিহাসে আর নেই…

এ ভালবাসা মৃত্যু-মলিন মর্ত্য-ভূমিতে স্বর্গ-খণ্ডের মত মানব-চেতনায় অমর হয়ে রয়ে গেল…

যখন শুনলেন, নরেন্দ্রের পিতৃ-বিয়োগ ঘটেছে, তাঁর সংসারের ভাবনায় সর্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসীর মন কেঁদে উঠলো।

তাঁর এক ধনী শিষ্যকে একদিন তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, নরেনের বাড়ীতে খাবার সংস্থান নেই…এই সময় যদি তার বন্ধুরা তাকে সাহায্য করতো, বড় ভাল হতো !

সেইকথা শুনে নরেন্দ্রের আত্মাভিমানে নিদারুণ আঘাত লাগে ! তাঁর সাংসারিক দারিদ্র্যের কথা অপরকে বলবার কি দরকার ?

শিষ্যটী চলে গেলে নরেন্দ্র রাগে বলে উঠলেন, ওঁকে ওসব কথা আপনি বলতে গেলেন কেন ?

নরেন্দ্রের মনে আঘাত লেগেছে বুঝে, তাঁর চোখে জল ভরে এলো…তাঁর দু'হাত ধরে ছোট ছেলের মত কাতরভাবে ঠাকুর বলে

উঠলেন, ওরে, তুই কি জানিস্ না, তোর জন্যে না করতে পারি এমন কোন কিছু নেই···দরকার হলে তোর জন্যে দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে বেড়াতে পারি!

নরেন্দ্রের সব ক্ষোভ ধুয়ে মুছে যায়···

অগাধ ভালবাসা সেই সঙ্গে তেমনি কঠোর শাসন···

সামান্যতম অশুচিতা যাতে নরেন্দ্রকে স্পর্শ না করে, তার জন্যে ছিল তাঁর অতন্দ্র সজাগ দৃষ্টি···

মহাশক্তির আধার যাকে হতে হবে···তাকে হতে হবে নিশ্ছিদ্র মহান্···

অজ্ঞাতসারে কোন অশুচি লোকের সংসর্গের স্পর্শটুকু যদি নরেন্দ্রকে লাগতো, তিনি জানতে পারতেন এবং অতি রূঢ়ভাবে তখন বলতেন, তোর মুখের দিকে চাইতে পর্যন্ত আমি পারছি না···

তাই যখন শুনলেন নরেন্দ্রের আত্মীয়বা তাঁর বিয়ে দিয়ে দেবার আয়োজন করছেন, পাগল হয়ে তিনি জননী ভবতারিণীর কাছে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন, মাগো, নরেনকে ডুবতে দিস্ নে মা! ওর যে অনেক কাজ!

৫৩

এমনি ধারা গুরু-শিষ্যে যখন চলেছে দেওয়া-নেওয়া, গুরু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন···

কঠিন গল-রোগ···

শিষ্যরা বিচলিত হয়ে উঠলেন, বিশেষ করে নরেন্দ্রনাথ, কারণ নরেন্দ্রনাথ তখন সম্পূর্ণভাবে গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন…

বেদ নয়, বেদান্ত নয়, দর্শন নয়, বিজ্ঞান নয়…ঐ যে চোখের সামনে যে লোকটী রয়েছে…তাঁর জীবনই ধর্ম…তাঁর কথাই বেদ…

এমন জীবন্ত পুঁথি ছেড়ে অন্য পুঁথির কি দরকার ?

তাই ঠাকুরের প্রত্যেকটী কথা, ওঠা-বসা, ভাবনা-চিন্তা, ভাব-ভঙ্গী, নরেন্দ্র পুঁথি-পড়ার মতন করে দেখেন…

নিদ্রায়, জাগরণে, স্বপ্নে…সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব…

তাই ঠাকুরের অসুখে নরেন্দ্র বিচলিত হয়ে উঠলেন। অন্তরের অন্তস্থলে মহা-আশঙ্কা জাগে, এখনো যে অনেক বাকি…সামনে যে সুদীর্ঘ পথ…সাথী, বন্ধু, গুরু বলতে তিনিই শুধু…সহসা যদি তিনি তাঁদের ত্যাগ করে চলে যান ?

তাই সহযাত্রী শিষ্যদের ডেকে নরেন্দ্র বলেন, আর সংশয়ের দোলায় দুলে সময় নষ্ট করা চলবে না…যেটুকু সময় আছে, যতক্ষণ তিনি আছেন, আর কোন কাজ নয়, আর কোন কথা নয়…বস পদ্মাসনে, বল বুদ্ধের মত, যদি এ দেহ ধূলোয় যায় মিশে, যাক…তবু, আসন ছেড়ে উঠছি না…

নরেন্দ্রের প্রেরণায় শিষ্যদের মধ্যে নতুন উৎসাহ দেখা দেয়…

তাঁরা বোঝেন আজ থেকে তাঁদের পথ স্বতন্ত্র…

গুরু নিভৃতে ডেকে নরেন্দ্রকে বলেন, ওরে, ওদের ভার তোরই ওপর দিলাম··

সেকথার মধ্যে নরেন্দ্র যেন শুনতে পান বিদায়ের পূর্ব-রাগিণী···

স্থির করেন, আর ঘরের মায়া নয়···ওরে বৈরাগী···জীবন-বীণায় জাগিয়ে তোল্ পথের রুদ্র রাগিণী !

৫৪

ঠাকুরের অসুখ বেড়েই চলে···

দক্ষিণেশ্বর থেকে চিকিৎসার সুবিধা হবে না বলে, ঠাকুরকে কলকাতায় আনা হলো···

সেখান থেকে কাশীপুরে একটা বাগান বাড়ী ভাড়া নেওয়া হলো···

নরেন্দ্র সহযাত্রী গুরুভাইদের নিয়ে পালা করে ঠাকুরেব সেবার ব্যবস্থা করেন···

ডাক্তার চলে গেলে নরেন্দ্র রাত্রি জেগে নিজে ডাক্তারী বই পড়েন···মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেন···

দেখেন, সেই অসুখের পরিণাম, ক্যান্সার···দুরারোগ্য···

বিদায়-দিনের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে···

কই, এখনো তো হলো না পাওয়া···চরম-পাওয়া···যা পেলে আর পাওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষাই থাকে না···

অন্তর-মন্দিরে চির-বাঞ্ছিতের আবির্ভাব···অনন্ত পুরুষের সঙ্গে অন্তর-রমণ···

কত দূরে সে মহা-লগ্ন ?

চকিতে আভাসে যার ছোঁয়া পাওয়া গেল···সে কি তার বেশী দেবে না ধরা ?

ঈশ্বর-বিরহে নরেন্দ্রের দেহে-মনে যেন বাড়বানল জ্বলে ওঠে··· সেই সঙ্গে যখনি ভাবেন, যাঁর কৃপায় এই সুদুর্লভ অনুভূতির সামান্যতম স্পর্শ পাবার পরম সৌভাগ্য ঘটেছে, হয় তো বেশীদিন তাঁকে আর কাছে পাওয়া যাবে না···তখনি শিশুর মতন আকুল হয়ে ওঠেন···

বাড়ীতে তখন মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে মহা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে··· স্বজন আত্মীয়েরা তাঁর মা ভাইবোনদের ভিটা-ছাড়া করবার জন্যে জাল বিস্তার করেছেন···

রাত্রিতে স্থির করেন, দু'একদিনের জন্যে কলকাতায় গিয়ে ও ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে আসবেন···

কিন্তু রাত্রিতে শুতে গিয়ে ঘুমোতে পারেন না···

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন···সঙ্গীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন··· তাঁদের জাগিয়ে তোলেন, বলেন, চল, বাগানে একটু ঘুরে বেড়াই···

তাঁরা সবাই মুখ-চাওয়া-চায়ি করেন···কি ব্যাপার ?

নরেন্দ্র বলেন, মনে হয় ঠাকুর আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন শিগ্‌গির···আর সময় নেই দু'নৌকোয় পা দিয়ে চলবার···আমরা ভাবছি, সংসারের সব কাজ গুছিয়ে তারপর ঈশ্বর-সাধনায় ডুববো···

তা হয় না…এই করে করে সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে…তিনি চলে গেলে আর দুঃখের অন্ত থাকবে না… তাই আমি ঠিক করলুম…আজ…এই মুহূর্তে…সব বাসনা জলাঞ্জলি দেবো…মূল শুদ্ধ টেনে উপড়ে ফেলবো…

সকলের মনে যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগে…

তারা-ঝিমঝিম্ পৌষের রাত্রি…তরুণ তপস্বীর দল সমিধ্ সংগ্রহ করে…শুকনো গাছের ডাল, পাতা, খড়কুটো…

এক জায়গায় স্তূপাকার করে, তার চার পাশে তাঁরা বসেন…

নরেন্দ্র নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দেন…বলেন, ঠিক এমনি সময়ে সন্ন্যাসীরা ধুনি জ্বালিয়ে বসে…আগুন জ্বালা…বল্…এই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাক সব বাসনা…

দেখতে দেখতে আগুনের শিখা তারার দিকে মাথা তুলে ওঠে…

সেই রক্ত আলোয় রাঙা হয়ে জাগে, বাংলাদেশে বিংশ-শতাব্দীর প্রথম প্রভাত…

৫৫

ঠাকুরের সেবার অবকাশে যখনি সময় পান, নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসেন…পঞ্চবটীর তলায়…

সেখানে গুরু-নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে ধ্যানে বসেন…

অসাধারণ একাগ্রতার ফলে…অতি কঠিন আসন অনায়াসে আয়ত্ত করে ফেলেন…

একটার পর একটা দ্রুত…অতি দ্রুত…গুরু সবই জানতে পারেন… আনন্দে তাঁর অন্তর ভরে আসে…

অন্য শিষ্যদের দেখিয়ে বলেন, দেখেছিস্, বিরহ কাকে বলে?

একদিন নিভৃতে প্রিয়তম শিষ্যকে তিনি কানে কানে রাম-মন্ত্র দিলেন, বলেন, আমার গুরু আমাকে এই দুটী অক্ষর দিয়েছিলেন, আমি তোকে দিয়ে গেলাম…

সেই দুটী অক্ষর…গুরুর মুখ থেকে পাওয়া…যেন কুবেরের ঐশ্বর্য্য!

নরেন্দ্র অবিরাম সেই নাম জপ করে চলেন…সারা বাড়ী ঘুরে ঘুরে বেড়ান পাগলের মত…মুখে রাম নাম…

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়…দিন যায়…সন্ধ্যা আসে…

শিষ্যরা এসে ঠাকুরকে জানান…

ঠাকুর বলেন, ওকে বাধা দিস্ নে…সময় হলেই ও আবার শান্ত হবে…

রাত্রিতে নরেন্দ্র আবার প্রকৃতিস্থ হন…

কিন্তু মুক্তি-তৃষ্ণা দুর্নিবার…

ঠাকুরের কাছে ছোটছেলের মত কেঁদে পড়লেন, অনেকে অনেক কিছু পেলো…আমি পেলাম কই?

ঠাকুর হেসে বলেন, বল্ কি চাস তুই?

নরেন্দ্র বলেন, আমি চাই দিনের পর দিন সমাধিতে ডুবে থাকতে…

গুরু গর্জন করে উঠলেন, ওরে বোকা, তার চেয়েও বড় অবস্থা আছে···যা—আগে বাড়ী গিয়ে ওদের একটা বন্দোবস্ত করে আয়··· আমি নিজে তোকে তা দিয়ে যাব···

ভোর না হতেই নরেন্দ্র বাড়ী ফিরে আসেন···

সকলে মিলে একসঙ্গে অনুযোগ করে, এ কি রকম ছেলে অন্ততঃ পাসটা দিয়ে ফেলতে আপত্তি কি ?

নরেন্দ্র আইন পরীক্ষা দেবার জন্য সেই সময় প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি আবার বই নিয়ে বসলেন। কিন্তু যেই বই খুলে পড়তে যাবেন, অমনি যেন মনে হলো, জগতের সবচেয়ে বড় পাপ করতে চলেছেন ···তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি ছুটতে আরম্ভ করলেন···

দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি ছুটতে আরম্ভ করলেন···পা থেকে চটি জুতো রাস্তায় পড়ে গেল···কাপড় বিস্রস্ত···পা কেটে ক্ষত-বিক্ষত···

দক্ষিণেশ্বরে এসে তবে তিনি থামলেন···গুরুর পায়ে পড়ে কেঁদে বলে উঠলেন, আমায় এমন কিছু খাইয়ে দিতে পারেন, যাতে, আমি যা কিছু পড়েছি, সব একেবারে ভুলে যাবো !

সস্নেহে গুরু শিষ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন···

৫৬

বিদায়ের দিন এগিয়ে আসে···

সে-কথা জানেন শুধু অস্তাচল-পথ-যাত্রী মহামানব···

মাঝে মাঝে ইঙ্গিতে আভাসে সে কথা শিষ্যদের জানান···

যাবার আগে, যা কিছু সঞ্চয়, নিঃশেষে হবে তা দিয়ে যেতে···

মানবতার কাছে ঋণ···মানবতার সেবায় তার হবে পরিশোধ···

দেখে আনন্দিত হন, তাঁর কথামত, নরেন্দ্র শিষ্যদের ভার নিয়েছেন··· নরেন্দ্রের সাহচর্যে তাঁরা সবাই চলেছেন সেই মহাপথে এগিয়ে···

একটী একটী করে গুরু দিয়ে যান, পথের নির্দেশ···

একদিন তাঁদের সকলকে ডেকে বল্লেন, ওরে আজ তোদের একটা নতুন কাজ করতে হবে···যা—দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে চাল নিয়ে আয়···সেই চাল আজ খাওয়া হবে···

নরেন্দ্র বোঝেন, এ বিধান শুধু আজকের জন্য নয়···

বারোটী তরুণ তপস্বী ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে বেরোয়···

কেউ বলে, ঢং···

কেউ দেয় তাড়িয়ে···কেউ দেয় হিতোপদেশ···কেউ করে বিদ্রূপ··· তিরস্কার···

ভ্রূক্ষেপ করে না নতুন ভিক্ষুর দল···আনন্দে নামগান করতে করতে দিনের শেষে আসে তারা ফিরে···

মহা-উল্লাসে সেই ভিক্ষার ধন রান্না হয়···নিজে গুরু প্রথমে তার একটী দানা মুখে দিয়ে বলেন, পরমান্ন! এই অন্নই দেবতারা খান!

৫৭

শিব-চতুর্দশীর রাত্রি···

সারাদিন উপবাসে কেটেছে···নরেন্দ্র গুটীকয়েক শিষ্য নিয়ে সারা রাত্রি ধ্যান-ধারণায় কাটাবেন বলে বসেছেন।

বাইরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল···আকাশে তখনো টুক্‌রো টুক্‌রো কালো মেঘ···

নরেন্দ্র গভীর ধ্যানে মগ্ন···

সহসা ধ্যান ভেঙ্গে দেখেন, তাঁর এক গুরুভাই কালী* তাঁর পাশে বসে ধ্যান করছে···

দু'জনেরই ধ্যান ভেঙ্গে গেল···

হঠাৎ নরেন্দ্র কালীকে বল্লেন, আমি আবার ধ্যানে বসছি···কয়েক মিনিট পরে তুই আমাকে ছুঁবি।

এই বলে নরেন্দ্র ধ্যানে বসলেন।

কিছুক্ষণ পরে ডান হাত দিয়ে নরেন্দ্রের জানু স্পর্শ করতেই, কালী নরেন্দ্রের সর্বশরীরে বিদ্যুৎ কম্পনের প্রবাহ অনুভব করলেন। নরেন্দ্র ধ্যানের পর কালীকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'কি রকম অনুভব করছিলি?' কালী বল্লেন: 'যেন ইলেকট্রীক ব্যাটারির কম্পন।' নরেন্দ্র বল্লেন: 'ঠিক বলেছিস্। একেই বলে কুণ্ডলিনীর জাগরণ।'

---

* পরে স্বামী অভেদানন্দ

৩৮

গুরুর আদেশে সহযাত্রী গুরুভাইদের নিয়ে নরেন্দ্র পড়াশোনা আরম্ভ করেন···

য়ুরোপের জ্ঞানগুরু আর ভারতের আরণ্যক ঋষি···প্রত্যেকের রচনা নরেন্দ্র গুরুভাইদের নিয়ে আলোচনা করেন···

কাশীপুরের সেই বাগান হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়···

নরেন্দ্রের জ্ঞান-পিপাসু মন সব জানতে চায়·· সব বুঝতে চায়···

গুরু মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে ক্ষেপিয়ে আলোচনাকে আরো জমিয়ে তোলেন···

এই ভাবে সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র নরেন্দ্র আয়ত্ত করে ফেলেন···ভগবান বুদ্ধের অমিত ত্যাগ ও কঠোর সাধনা তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করে···

কিন্তু শুধু পাঠে তাঁর সর্বগ্রাসী চিত্ত তৃপ্তি পায় না···মনে মনে স্থির করেন, বুদ্ধগয়ায় গিয়ে যে বৃক্ষ-মূলে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন তিনিও সেখানে গিয়ে সাধনায় বসবেন···

অন্তর দিয়ে ভারত-ইতিহাসের সেই মহাপুরুষের ভাবধারাকে উপলব্ধি করবেন···

কাউকে কিছু না বলে, ঠাকুরের সেবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিয়ে তিনি, তারক আর কালীকে সঙ্গে করে বৌদ্ধ-গয়া যাত্রা করলেন···

গয়া থেকে সাত মাইল পথ পায়ে হেঁটে তিন বন্ধুতে বৌদ্ধ-গয়ায় গিয়ে উপস্থিত হলেন···

চারদিক নির্জন নীরব· অতীতের স্মৃতিতে সুপবিত্র·

সন্ধ্যায় তিনজনে বোধি-বৃক্ষতলে গিয়ে ধ্যানে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রের সব-দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো···দুই চোখ ফেটে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে···আকুল আবেগে তারককে জড়িয়ে ধরেন

মুখে দিব্য-করুণার ছায়া·

ব্যাকুল আগ্রহে বন্ধু জিজ্ঞাসা করে, কি হলো নরেন?

নরেন্দ্র বলেন, ভগবান তথাগতের ধ্যান করতে করতে দেখলাম, ভারত-ইতিহাসের দিব্য-রূপ···ছবির মতন চোখের সামনে·· একটার পর একটা ভেসে চলে গেল···শাশ্বত ভারত·· দিব্য ভারত আমি যেন যুগে যুগে তার মধ্যে বাস করে এসেছি··

এধারে নরেন্দ্রের অদর্শনে গুরুভাইরা চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

তাঁরা ঠাকুরের কাছে তাঁদের অন্তরের ব্যাকুলতার কথা জানান।

ঠাকুর তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, সে কোথাও যায় নি রে' এই এলো ব'লে!

ক্রমশ দিন আরো কাছে এগিয়ে আসে···মহা-বিদায়ের দিন

একদিন বড় রাখাল কতকগুলি গেরুয়া কাপড় আর রুদ্রাক্ষ নিয়ে এসে ঠাকুরকে দিলেন, সাধুদের দেবার জন্যে!

ঠাকুর যেন তারই জন্যে অপেক্ষা করে ছিলেন।

তাঁর শিষ্যদের দেখিয়ে বল্লেন, ওরে, এদের চেয়ে ভালো সাধু আর কোথায় পাবি? এগুলো এদের দে!

গুরু নিজে তাদের হাতে গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষ তুলে দিলেন···

তারপর একদিন তাদেব সকলকে ডেকে দীক্ষা দিলেন ··বল্লেন, আজ থেকে তোদের আর কোন জাত রইলো না!

৬০

গুরুর কথা শুনে শুনে নরেন্দ্রের স্থির বিশ্বাস হয়, আর বেশীদিন দেরী নেই···

অন্তরে হাহাকার নিবিড় হয়ে ওঠে···কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ করতে পারেন না···

হায় সর্ব-গ্রাসী মন! চরম-পাওয়া তো এখনো রয়েছে বাকি···

সব সাধনার সাব···সেই বিরাট আত্ম-বিলুপ্তি···ব্রহ্মে একান্ত লীন হওয়া···

অনন্ত কোটী রমণের স্বাদ যার স্বাদের তুলনা নয়!

বিদায়-পথ-যাত্রী, তরুণ পথিকের মনের দিকে চেয়ে বোঝেন, কোথায় তার বেদনা!

একদিন বড় গোপাল আর নরেন্দ্র এক ঘরে বসে ধ্যান করছেন।

সহসা নরেন্দ্রের মনে হলো, ঠিক তাঁর মাথার পেছন দিকে দপ্ করে তীব্র আলোর ঝলক যেন জেগে উঠলো···সে-আলোর বিন্দু ক্রমশ বড় হতে লাগলো···বড় হতে হতে তা যেন নিজের তেজে নিজে ফেটে পড়লো···

সে-আলোতে তাঁর সব চেতনা বিলুপ্ত হয়ে গেল…এবং সেই পরম-ক্ষণে যে মহা-অনুভূতি তাঁর চিত্তলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, জগতের কোন ভাষা নেই তার আংশিক বর্ণনাও করতে পারে!

কিছুক্ষণ পরে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, গোপালদা, গোপালদা, আমার দেহ গেল কোথায়?

গোপালের ধ্যান ভেঙ্গে গেল…তিনি দেখলেন, নরেন্দ্রের সর্ব-দেহ পাথরের মত হয়ে গিয়েছে…

কি করবেন স্থির করতে না পেরে ছুটে ঠাকুরকে খবর দিতে উঠলেন।

ঠাকুরের ঘরে এসে দেখেন, ঠাকুর স্থির, নিস্পন্দ!

তবুও গোপাল ভীত কণ্ঠে নরেন্দ্রের সংবাদ জানালেন।

ঠাকুর মৃদু হেসে বল্লেন, ওকে ঐ ভাবে থাকতে দে…আমাকে বড় জ্বালিয়ে ছিল এর জন্যে!

মধ্যরাত্রির দিকে নরেন্দ্রের চেতনা ফিরে এলো…ধীরে ধীরে নয়ন মেলে দেখেন, তাঁকে ঘিরে গুরুভাইরা সবাই বসে আছেন…কারুর মুখে কোন কথা নেই…ধীরে ধীরে স্মৃতি ফিরে আসতে লাগলো…যেন অমৃত সাগর থেকে স্নান করে এই সবে উঠছেন…চারিদিকে অমৃত সৌরভ… আর কোন ক্ষোভ নেই…কোন দুঃখ নেই…কোন চাঞ্চল্য নেই…

স্মিত-আননে ধীরে ধীরে গুরুর কাছে এসে তাঁর পায়ে প্রণাম করলেন।

সস্নেহে প্রিয়তম শিষ্যকে কাছে ডেকে নিয়ে বল্লেন, মার দয়ায় সব তো এবার বুঝলি! কিন্তু এ অনুভূতি আমি বাক্সতে চাবি দিয়ে রাখলাম আর সে-চাবি রইলো আমার কাছে…জগতে তোকে অনেক কাজ করতে হবে…যখন তোর কাজ শেষ হয়ে যাবে…তখন আবার এই বাক্স খুলে সব পাবি…এখন আর নয়!

গুরুকে প্রণাম করে নরেন্দ্র বিশ্রাম করতে যান।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠাকুর অন্য শিষ্যদের বলেন, যে-মুহূর্তে ও বুঝতে পারবে, ও কে, সেই মুহূর্তে ও দেহত্যাগ করবে…

৬১

দেওয়া-নেওয়া প্রায় চুকে আসে…

দিন হয়ে আসে শেষ…

ঠাকুব একদিন হঠাৎ নরেন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন…

তাঁর সামনে তাঁকে বসালেন…

একদৃষ্টিতে প্রিয়তম শিষ্যের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে গভীর সমাধিতে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন…

নরেন্দ্র চলৎ-শক্তি-হীন হয়ে সেখানে বসে থাকেন…তাঁর স্পষ্ট মনে হয়, তাঁর সর্ব-দেহে যেন কি এক তড়িৎ-শক্তি অনুরণিত হয়ে চলেছে…

ক্রমশ সব সংজ্ঞা তাঁর যায় চলে…

যখন আবার জ্ঞান ফিরে আসে, তখন দেখেন, ঠাকুরের দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে!

করুণায়, স্নেহে, সারা মুখ দিব্য-প্রভাতের মত সমুজ্জল···

প্রিয় শিষ্যের হাত ধরে বলেন, ওরে, আমার যা কিছু ছিল, আজ উজাড় করে সব তোকে দিয়ে দিলাম···আজ আমার আর কাণা কড়িও নেই···ফকীর···জানি, এই দিয়ে তুই জগৎ টলাবি···

গুরু শিষ্যতে হলো লীন···

৬২

এই ঘটনার তিনদিন পরে···

কাশীপুর বাগান···মৃত্যু-তীর্থ···

গুরুর পার্থিব দেহ তাঁরা বহন করে গঙ্গার তীরে নিয়ে এলেন···

সেখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল···

সেই চিতা-ভস্ম অবশিষ্ট বহন করে তাঁরা কাশীপুর বাগানে ফিরে এলেন···

বারো জন সহায়সম্বলহীন দরিদ্র বাঙালী যুবক···আর তাঁদের নেতা···নরেন্দ্রনাথ···

সেই দিন নরেন্দ্রনাথ শপথ করলেন, আর ঘরে ফিরবেন না···

বিশ্বের পথে এসে দাঁড়ালো এক তরুণ তাপস···বিবেকানন্দ যাঁর নাম···

জননী

১

পরমহংসদেব দেহরক্ষা করেছেন।

চুঁচুড়ার গঙ্গার ধারে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সেই কথা নিয়ে আলোচনা করছেন…

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাগর-বাহিনীর দিকে চেয়ে বলেন, এই গঙ্গা বেয়ে দিনের পর দিন দক্ষিণেশ্বরের পাশ দিয়ে গিয়েছি আর এসেছি, এমনি দুর্ভাগ্য, সেদিন একবারও মনে হয় নি যে, ঘাটে নেমে দেখে আসি কি হচ্ছে না হচ্ছে…

যে-অপরাধ-বোধে সেদিন ভূদেবের দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল, বিংশ-শতাব্দীর মধ্যপাদের বাঙালী যুবকদের মনে তার কোন রেখা নেই।

তাদের জীবনের বিশ গজের মধ্যে পড়ে আছে দক্ষিণেশ্বর…মৃত অরণ্য…

তার পাশ দিয়ে তারা মুখ ফিরিয়ে চলেছে মস্কো, নিউইয়র্ক, বার্লিন, প্যারিসের দিকে…

আর সেই মস্কো-বার্লিন-প্যারিসের দেশ থেকে আত্মনির্বাসিত এক মহাপুরুষ য়ুরোপকে ডেকে বজ্র-নির্ঘোষে বলে গেলেন, বৈজ্ঞানিক আত্মহত্যার এই নির্মম প্রতিযোগিতা থেকে, হে পশ্চিম, ফিরে যাও আবার পূর্বের দিকে, যেখানে গঙ্গার ধারে দক্ষিণেশ্বরে নিঃশব্দ

আযোজনে সমাধা হযে গেল এ যুগেব সর্বশ্রেষ্ঠ মানবীয় পবীক্ষা··· ফুটলো ভেদ-সংক্ষুব্ধ জগতে মিলনের মহাপদ্ম। হে পশ্চিম, সেই তোমার শেষ-তীর্থ···

তাব বিশ গজের মধ্যে আমবা পড়ে আছি, আমাদেব চোখের সামনে ঘটে গেল জগতেব চবম বিস্ময়···অথচ আমাদের জাতীয চেতনায নেই বিন্দুমাত্র আলোড়ন।

বেলুড়েব গঙ্গাব ধাবে বিবেকানন্দের শেষ দীর্ঘশ্বাসও মিলিযে গেল আমাদেব চোখেব সামনে···

কোথায মাতৃ-মন্ত্রে-সমর্পিত-প্রাণ হাজাবটি তাজা ছেলে!

২

মাতৃ-মন্ত্র···অভয-মন্ত্র · আদিম প্রাণ-যজ্ঞে সেই মন্ত্রে হযেছে আমাদের জন্ম···

মহাকাশের মত তা ছেযে আছে আমাদেব চেতনা···

আমাদের নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে, প্রতি বক্তকণিকায আছে সেই একাক্ষরা মন্ত্রের সম্মোহন··

যাব দৈবী-প্রেরণায প্রতিযুগ-সন্ধিক্ষণে সুনিশ্চিত মৃত্যুর শত অপঘাত তুচ্ছ কবে বারে বারে আমরা বাঙালী জেগে উঠেছি নব-জীবনেব নবীন প্রত্যূষে···

তাই আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব সেই মাতৃ-মূর্তিকে ঘিবে···

তাই মৃন্ময়ী মাটীকে আমরা জানি মা বলে, চিরসুন্দরী চিন্ময়ী···

তাই আমাদেব যে-দেবতা, সেই আমাদের দেশ···সেই আমাদের ধ্যান, সেই আমাদের ধারণা।

নারী সেই মাতৃ-মূর্তির মর্ত্য-প্রতীক···

তাই চিব-পৌত্তলিক আমবা, নারী-পূজায় আমাদের সব পূজার অবসান···

য়ুরোপ যেদিন নাবীকে ভোটাধিকার দেবে কি দেবে না, তাই নিযে তুমুল সংগ্রামে ব্যস্ত, সেদিন সেইক্ষণে এই বাংলাদেশে এক উন্মাদ প্রত্যক্ষ জীবনে সব সাধনার চরম ফল সাক্ষাৎ পূজায় নারীর চরণে নিবেদন করে জগতে প্রতিষ্ঠা করে গেল নারীর সর্বোত্তম বেদী···

নারী-লাঞ্ছনা আর নারী-অবজ্ঞার পাপের একা প্রায়শ্চিত্ত কবে গেল সমগ্র জাতির হয়ে।

সে নারী তাঁরি বিবাহিতা পত্নী, জননী সারদামণি দেবী।

৩

নারী-স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে নারীত্বের এই সর্বোত্তম স্বীকৃতির কথা, আজও পর্যন্ত কেউ লিখেছেন বলে দেখি নি, না পশ্চিমে, না পূর্বে।

ঊনবিংশ-শতাব্দীর চরম বৈশিষ্ট্য হলো যে সে নতুন করে বহু জিনিসের নব-মূল্য ধার্য করে গেল···

আমাদের অনেকের ধারণা, সেই তাদের শেষ মূল্য, এবং ঊনবিংশ-শতাব্দীর ইতিহাস হলো য়ুরোপেরই ইতিহাস।

কিন্তু নতুন করে যেদিন সভ্যতার ইতিহাস লেখা হবে, সেদিন আজকের ইতিহাসের অনেক পাতা ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে···আজকের ইতিহাসে যে-সব নাম বড় বড় অক্ষরে লেখা হলো, আপনা থেকে তার অনেক সেদিন মুছে যাবে···বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক আত্মম্ভরিতায় পশ্চিম যে-সব কথা স্বীকার করতেই চাইলো না, সেদিন তৃষ্ণার্তের মত তাকে আবার ছুটে আসতে হবে আজকে যা রয়ে গেল অবজ্ঞার আড়ালে চাপা, তার কাছে···এই অতি পুরাতন পূবের কাছে, এবং সেদিন দক্ষিণেশ্বরের এই একটী মানুষের অপরূপ জীবন-সাধনা, জাতি-ধর্ম-দেশ ও কালের ঊর্ধ্বে জগতের বহু ব্যর্থ জিজ্ঞাসার চরম উত্তর জোগাবে।

ঊনবিংশ-শতাব্দীর য়ুরোপ নারীকে যে-মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছিল, তার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে সেদিন দক্ষিণেশ্বরে···সংবাদপত্র-বিঘোষিত প্রচলিত ইতিহাসের বাইরে।

জগৎ সেদিন মনে করেছিল, সেটা একটা বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ঘটনা, একজন উন্মাদের ব্যক্তিগত একটা খেয়াল।

কিন্তু আজ আমরা দেখছি, বিশ্ব-চিন্তা-ধারার সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ-ভাবে সংযুক্ত···এবং একটা যুগের অসম্পূর্ণতাকে, যুগাধিশ্বর সেই মহাপুরুষ, সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণ করে রেখে গেলেন।

একদা ঊনবিংশ-শতাব্দীর এক অমাবস্যা রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরে এক অপূর্ব পূজা-অনুষ্ঠান সংগঠিত হয়। তার নাম ষোড়শী-পূজা।

নর-নারীর সম্বন্ধের ইতিহাসে, এই নির্বাপিত-অগ্নি মর্ত্য-গ্রহে, এই অনুষ্ঠানটী অতল-কামনা-সিন্ধুর মন্থন-শেষ অমৃত-ফল…

শুকতারার মত জ্বলছে ঊনবিংশ-শতাব্দীর বাণী-শেষের আকাশে।

৪

দক্ষিণেশ্বরের স্নানের ঘাটে স্নানার্থিনীরা ইদানীং প্রায়ই দেখেন, এক উন্মাদ যুবা ভাঁটার গঙ্গার তীরে বালি আর মাটীর উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে আর অঝোর-ধারায় মা-মা বলে কাঁদছে। মাতৃ-অন্তর করুণায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। স্নান সেরে ঘট ভরে যখন ঘাট থেকে তাঁরা একে একে ফিরে চলে যান, তখনও দেখেন সেই যুবা তেমনি আপনার মনে মা-মা বলে ডেকে চলেছে। চলে যেতে যেতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁরা বলেন, আহা, কার বাছা গো! কেউ বা কোন কারণ অনুমান করে বলেন, হয়ত শোকে-তাপে পাগল হয়ে গিয়েছে।

ঘাট খালি হয়ে আসে।

দুপুরের রোদে ভাঁটার মাটী শুকিয়ে ওঠে। উন্মাদ তীর থেকে উঠে গঙ্গার ধারে ধারে বন-পথ দিয়ে চলে। মুখে সেই একাক্ষরা বেদনার বাণী, মা, মা, মাগো!

ক্রমে নির্জন গঙ্গার তীরে সন্ধ্যা নেমে আসে। আকাশে ওঠে তারা, বনে জেগে ওঠে জোনাকীরা। ঝিঁঝি-ডাকা অন্ধকারে গাছের পাতার

মৃদু-মর্মরের পাশে অস্পষ্ট শোনা যায় জোযারের জল-কলরোল। সারাদিনের আকাশ-পরিভ্রমণ সেরে তীরাশ্রিত গাছের নীড়ে নীড়ে ফিরে আসে নভচারীর দল। অশ্রান্ত কূজনে কণ্টকিত হয়ে ওঠে ভাগিরথী-তীরাশ্রিত কৃষ্ণারাত্রির নিস্তব্ধতা। তাও ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে ক্রমশ তীর-আর-নীরব্যাপী সেই বিপুল নীরবতায় নিঃশেষে যায় হারিয়ে। জেগে থাকে শুধু গঙ্গা, আর জাগে তার তীরে সেই উন্মাদ বলে, কি হবে এই চোখে, যদি চাইলেই মা, না পাই তোর দেখা?

গঙ্গার তীরে তীরে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমায় বাংলা·· স্বপ্নহীন ঘুমে অচেতন···

সেই মহা-সুষুপ্তির মধ্যে জেগে ওঠে বিশ্ব-বিবর্তনের প্রণব-ধ্বনির মত, উন্মাদের কণ্ঠে মাতৃ-নাম। সবাই ফিরেছে ঘরে, মাতৃহীন ঘরে ফিরবে না শুধু উন্মাদ

৫

শুধু চকিতে, বিদ্যুৎঝলকে, সে দেখেছে এই মর্ত্য নয়নে দিব্য-মাধুরী·· দেখেছে বিশ্বের জননীকে চির-আকাঙ্ক্ষিত মাতৃ-রূপে।

সে কি তার দৃষ্টির ভ্রম? সে কি তার নিজেরই মনের উদগ্র বাসনার মায-প্রতিচ্ছবি?

ছুটে গিয়ে উন্মাদ মন্দির-বাসিনী পাষাণী প্রতিমূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়···পাষাণ-মূর্তির নাসিকার সামনে অতি সন্তর্পণে নিজের হাতের আঙুল রাখে · এই তো তপ্ত স্নিগ্ধ নিঃশ্বাস তার হাতে এসে লাগছে···

এই তো স্পষ্ট অনুভব করছি, এই রাত্রি-জোড়া অন্ধকারে তুই মা কোল পেতে বসে আছিস্…

মন্দির ছেড়ে উন্মাদ ছুটে বেরিয়ে আসে আবার গঙ্গার ধারে। চকিতে তবে যে দিব্য আবির্ভাব তার চেতনার মূলে জ্বালিয়ে দিয়েছে এই বিশ্বগ্রাসী বেদনা, নিত্য মতিতে সে কেন দেবে না ধরা? যার অস্তিত্ব প্রত্যেক মুহূর্তে করছি অনুভব, অনুভূতির ঊর্ধ্বে কেন তা হবে না ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য? এই যে গাছ-পালা, নদী নীর, কান্না-হাসি, স্পর্শ-চেতনা, কেন এদেরই মতন বলতে পারবো না, তোমাকে দেখেছি, তোমাকে জেনেছি, তোমাকে পেয়েছি·· আমারই মতন, তুমিও আছ…আমার মধ্যে তুমি আছ, তোমার মধ্যে আমিই আছি তোমার-আমার এই নিত্য সম্পর্ক চিরকালের মত, সব রহস্য ছিন্ন করে হয়ে যাক বিশ্ব-চেতনায় সুপ্রতিষ্ঠিত!

তাই মহা-বিরহের সপ্তসমুদ্র উদ্বেল হয়ে ওঠে উন্মাদের বুকে…সমস্ত বাহ্য-জগৎ সামান্য লোষ্ট্রখণ্ডের মত ডুবে যায় সেই বিপুল তরঙ্গ-গভীরতায়।

৬

আশে-পাশে যারা থাকে, বহু গবেষণার পর তারা স্থির করে নেয়, মস্তিষ্ক-বিকৃতি…বায়ু-রোগ…

দেখতে দেখতে রাষ্ট্র হয়ে যায়, গদাধর পুরোহিত পাগল হয়ে গিয়েছে!

মাঝে মাঝে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে…বাইরে থেকে লোকে তাই অনুমান করে। চিকিৎসা হয় কিন্তু কিছুদিন বাদেই আবার যে-কে সেই!

বদ্ধ উন্মাদ।

কথাটা ঘুরতে ঘুরতে কামারপুকুরে গিয়ে পৌছয়।

জননী চন্দ্রমণি দেবী তখনও জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, এমন সময় কনিষ্ঠপুত্রের সেই উন্মাদ-রোগের কথা শুনে একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। স্বভাবতই কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য মার স্নেহের একটু পক্ষপাতিত্ব থাকে, তার ওপর ছেলেবেলা থেকেই গদাধর উদাসীন-প্রকৃতির বলে, মার সমস্ত মন সেই ছেলেটির কাছেই পড়ে থাকতো। বহু চেষ্টাচরিত্র করে তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে গদাধরকে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন।

পুত্রের উন্মাদ-রোগ যাতে সেরে যায়, তার জন্যে মা হেন দেবতা নেই যার দরজায় মানত মানলেন না…ঝাড়-ফোঁক থেকে যে যা ব্যবস্থা বলে, তাই করেন। মার সেই মর্মান্তিক স্নেহের কাছে গদাধর সাময়িকভাবে আত্মসমর্পণ করেন। অন্তরের তরঙ্গ অন্তরেই গর্জন করে, বাইরে তার প্রকাশ কেউ দেখতে পায় না।

প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলেই উপদেশ দেয়, পুত্রের বিবাহ দাও, এ রোগ সেরে যাবে। গদাধরের তখন চব্বিশ বছর বয়স। সেকালের প্রথা অনুযায়ী বিয়ের বয়স যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু মার মনে ভয় হয়। যদি বিবাহের কথা শুনে উদাসীন বিবাগী পুত্রের মন বেঁকে দাঁড়ায়! এমনি ধারা যারা অল্পবয়সে সন্ন্যাসী

হতে চেয়েছে, তারা তো সবাই বিবাহের কথা শুনেই গৃহত্যাগ করেছে। তাই অতি সংগোপনে বিবাহের চেষ্টা চলতে থাকে। চারদিকে উপযুক্ত সুন্দরী পাত্রীর জন্যে খোঁজাখুঁজি চলতে থাকে এবং অতি সন্তর্পণে, সংগোপনে চলে সে চেষ্টা। যাতে গদাধর ঘুণাক্ষরে তা জানতে না পারেন। সব আয়োজন ঠিক করে, মা কাতর মিনতি জানাবেন। তখন কি মার সেই কাতর মিনতি গদাধর এড়াতে পারবেন ?

কিন্তু বেশীদিন এই ব্যাপার গোপন রাখা চল্লো না। গদাধর একদিন জানতে পারলেন, তাঁর উম্মাদ-রোগের শেষ ঔষধ স্বরূপ তাঁর জননী বিবাহের আয়োজন করছেন।

জননীর মন আশঙ্কায় দুলে উঠলো, এইবার বুঝি গদাধর একদিন রাত্রিবেলা নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করে চলে যায় !

কিন্তু কি আশ্চর্য ! গদাধর হেসে বল্লেন, একথা আমাকে আগে বলতে হয় ? তাহলে আর এতো ছুটাছুটি, এত হাঙ্গামা করতে হতো না !

মা অবাক হয়ে পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। কি বলতে চায় উম্মাদ ?

হেসে উম্মাদ নিজের পাত্রীর সন্ধান নিজেই দিয়ে দেন, জয়রামবাটিতে গো···রামচন্দ্র মুখুজ্জের মেয়ে···সেখানে কুটো বেঁধে রাখা আছে··· দেখগে সেখানে !

সংসার-বিরাগী উম্মাদ সন্ন্যাসী নিজে যেচে তার বিবাহ-বন্ধনের সন্ধান বলে দেয় !

কোথায় গঙ্গার তীরে বাহ্যজ্ঞানশূন্য সেই উন্মাদ? আর কোথায় এ বিবাহে-ইচ্ছুক পাত্র, নিজের পাত্রীর সন্ধান নিজে দিচ্ছে বলে?

এ কি অসম্ভব বিসদৃশতা?

৭

সেদিন প্রত্যেক লোকেরই মনে এই সন্দেহের প্রশ্ন জাগতে পারতো।

জগৎ দেখেছে, যুবরাজ গৌতমকে নিশীথরাত্রে নিদ্রিতা যশোধরাকে ত্যাগ করে চলে যেতে···

দেখেছে, বিষ্ণুপ্রিয়ার অঞ্চল ছিঁড়ে নিমাইকে নবদ্বীপ ত্যাগ করতে··

শুনেছে, জেরুজালেমের ঋষির চিন্তায় নারী-সঙ্গ বর্জনের উপদেশ···

পড়েছে, লোক-শাস্ত্র বলে নারী ঈশ্বরোপলব্ধির চরম ব্যাঘাত···

সর্বদেশে সবকালে বৈরাগী সন্ন্যাসীরা যে-পথে তাঁরা এসেছেন, সেই পথকেই ঘোষণা করেছেন নরকের দ্বার বলে···

আর একদিকে, সেই নারীকে নিয়েই জগৎ মহাকাব্য রচনা করেছে··· প্রিয়তমা নারীর সুকোমল গণ্ডের একটী কালো তিলের জন্য সমরকন্দ-বোখারা বিলিয়ে দিতে চেয়েছে···যত পুড়েছে নারীর রূপের আগুনে, তত বেশী করে চেয়েছে নারী-সঙ্গ···

নরকের দ্বার আর কামনার তিলোত্তমা, এই দুই পরস্পর-বিরোধিতার মধ্যে, নারী যেন জগতের অনন্ত প্রহেলিকা···

তাই বিঘ্ন আশঙ্কা করে ধর্ম-জগৎ নারীকে সুবৃহৎ সমস্যার মত সভয়ে দূরেই রেখে চলে এসেছে।

তাই সেদিন সেই উন্মাদ সন্ন্যাসীর আচরণে সকলেই বিস্মিত হয়েছিল। তবে আমরা, তাঁর সম্পূর্ণ জীবনের অভিব্যক্তি আমাদের চোখের সামনে দেখছি, আমরা জানি সর্ববিরোধের মধ্যে ওতপ্রোত মিলন-সূত্রটীকেই খুঁজে বার করবার জন্যে তিনি এসেছিলেন। তাঁর জীবন দলে দলে সম্পূর্ণ একখানি পূর্ণ প্রস্ফুটিত মিলনের শতদল। জগৎ-ব্যাপারে নারীর এই প্রহেলিকাচ্ছন্ন অনির্দিষ্টতাকে তিনি তাঁর বিচিত্র জীবন-সাধনায় সুনির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। ঊনবিংশ-শতাব্দীর সন্তানরূপে সেই শতাব্দীর সদ্য-জাগ্রত এই চেতনা তাঁর মনকে এড়িয়ে চলে যায় নি। তখন য়ুরোপ নারীকে একটা নব-মর্যাদা দেবার চেষ্টা করছে এবং তার ঢেউ আমাদের দেশের তটপ্রান্তে এসে সবে মাত্র আঘাত করেছে। সেই সদ্য-আগত নবীনতার উৎসাহে আমরা হঠাৎ একেবারে ঘরের পর্দা টেনে ছিঁড়ে ফেলে নারীকে ঘোড়ায় চড়িয়ে পথে আমাদের পাশে নিয়ে গর্ববোধ করেছি যে, একটা মস্তবড় কর্তব্যপালন করলাম। সেই সময়, এই যুগাধিনায়ক তাঁর বিচিত্র ধর্ম-সাধনার মধ্যে যুগ-ধর্মের এই অন্যতম প্রধান সমস্যাটিকেও অন্তর্ভুক্ত করলেন। তাই দেখি, সেই তীব্র বৈরাগ্যের মহাপ্রান্তরের মধ্যে বয়ে চলেছে নারী-মর্যাদার মহাস্বীকৃতির এই রজত-শুভ্র-ধারা। বিরোধের আশঙ্কায় যে সমস্যাকে ধর্ম-জগৎ এড়িয়ে চলেছিল এতদিন, জগতে তিনিই প্রথম দেখালেন, তার মধ্যে বিরোধ বলে কিছু নেই। এই বহুধা সৃষ্টির মধ্যে নারী বিধাতার সুন্দরতম কীর্তি এবং নারীকে বর্জন করে নয়, নারীকে গ্রহণ করেই আসবে

জীবনের মহাসম্পূর্ণতা। তবে এই গ্রহণ করার তারতম্যের মধ্যেই আছে জগতের ক্রটী। প্রত্যেক নারীই জায়া ও জননী এবং একই দেহে সে জায়া ও জননী। জায়ারূপে তার সূচনা, জননীরূপে তার পূর্ণবিকাশ। জায়ারূপে সে পুরুষের সঙ্গে যৌন-আকাঙ্খায় সম্পৃক্ত এবং জীব-সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করার সঙ্গে সঙ্গেই তার জায়াত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। জায়াত্বের পরিসমাপ্তি যেখানে সেইখানে সুরু হয় জননীত্বের। নারী তখন যৌন-কামনার উধ্বে পুরুষের লীলা-সহচর, পুরুষ তখন কামজয়ী অমৃতপথের পথিক। যৌন-ক্ষুধার বাইরে পুরুষ ও নারীর সেই মানস-সঙ্গম, আত্মিক জীবরূপে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। মৃত্যু পর্যন্ত নারীকে যৌন-শৃঙ্খলে বেঁধে, নারীত্বের সঙ্গে সঙ্গে মানবত্বকেও আমরা ক্ষুণ্ণ করেছি। নারীত্বের মহাসম্ভাবনাকে অতি অল্প মূল্যে বিকিয়ে দিয়েছি। তাই আজন্মব্রহ্মচারী প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্যে এই মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যেই সেদিন স্বেচ্ছায় এবং আনন্দে বিবাহের সেই বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করেন। এই যৌনক্ষুধাতুর অতৃপ্ত পৃথিবীতে বাস্তবজীবনে নারীকে যে মহিমা তিনি দান করে গেলেন, জগতের কোন কবি, কোন ঔপন্যাসিক নর-নারী-সম্পর্কের সেই মাধুরী কল্পনাও করতে পারেন নি। জীবন যদি কাব্য হয়, এত বড় মহাকাব্য ইতিহাসের জগতে আর দেখা যায় নি।

৮

উল্লসিত হয়ে জননী চন্দ্রমণি দেবী জয়রামবাটীতে ঘটক পাঠালেন

পাত্রী আছে বটে কিন্তু সবে পাঁচ বৎসর শেষ করে ছ'বৎসরে পড়েছে। জয়রামবাটীর খেজুর গাছতলায় আপনার মনে খেজুর কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

উন্মাদের এ কি নতুন কোন খেয়াল ?

আত্মীয়-স্বজনেরা চিন্তিত হয়ে পড়ে, পাত্রের বয়স চব্বিশ, আর পাত্রীর বয়স মাত্র পাঁচ !

পাঁচ বছরের মেয়ে এই উন্মাদকে কি করে ধরে রাখবে ?

কিন্তু উন্মাদ বলে, ভাবছো কি গো, ঐখানেই বিয়ে হবে !

ভবিতব্যতা বলে জননী তাতেই স্বীকৃত হন।

বৈশাখ মাসের শেষ দিকে যথারীতি বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

বিবাহের সময় সাতাশ কাঠি জ্বেলে পুরনারীরা যখন বর আর বধূকে পরিক্রমণ করছেন, সেই সময় হঠাৎ একটা জ্বলন্ত কাঠের আগুন লেগে বরের হাতে-বাঁধা হলুদ-রঙের মাঙ্গলিক সুতো পুড়ে গেল।

পুরনারীরা ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন।

বর কিন্তু তখন মধুর হাসছেন·· তখন কেউ না জানলেও তিনি তো জানেন, কামনার রঙীন রাখি অন্তরের আগুনে পুড়িয়ে ফেলেই না নব-বধূকে জীবনে গ্রহণ করতে হচ্ছে !

৯

পাঁচ বছরের ছোট্ট বউটী খেজুরতলার খেলাঘর থেকে শ্বশুর বাড়ীর খেলাঘরে চলে এলো।

পরে যখন মাকে তাঁর বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বলেছিলেন, শুধু মনে পড়ে, বিয়ের পর বাপের বাড়ী ফিরে গিয়ে খেজুরতলায় খেজুর কুড়িয়ে বেড়াতাম···তখন খেজুর পাকবার সময়।

জননী চন্দ্রমণি দেবীর বড় সাধ—ছোট্ট বউটীকে গয়না দিয়ে সাজাবেন। পাড়ার লাহাবাবুদের বাড়ী থেকে চেয়ে নিয়ে এসে বালিকাকে নানা অলঙ্কার দিয়ে সাজালেন। রাত্রিতে সেই এক-গা গয়না নিয়ে আনন্দে বালিকা ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু গয়না তো ফিরিয়ে দিতে হবে! ছোট্ট মেয়ের গা থেকে গয়না খুলে নিতে বৃদ্ধার অন্তরে আঘাত বেজে উঠলো। অথচ নিরুপায়! কি করা যায়?

গদাধর বল্লেন, তুমি ভেবো না, মা! ঘুমন্ত অবস্থায় আমি এমন কায়দা করে খুলে নেব যে ও জানতেই পারবে না!

সেই রাত্রিতে গদাধর ঘুমন্ত বালিকা-বধূর অঙ্গ থেকে একে একে সব গয়নাগুলি খুলে নিলেন। বালিকা জানতেই পারলো না।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে সারদামণি দেখেন, তাঁর গায়ে একটীও গয়না নেই! দুঃখে বালিকা কেঁদে উঠলো।

—আমার গয়না কোথায় গেল ?

বালিকা-বধূকে আদরে কোলে তুলে নিয়ে জননী সান্ত্বনা দেন, তোমার গয়নার ভাবনা কি মা ? তুমি বড় হও, আমার গদাধর তোমাকে ঐ গয়নার চেয়ে ঢের ভাল গয়না গড়িয়ে দেবে !

কিন্তু বিপত্তি ঘটালেন পাত্রীর খুড়ো এসে। তিনি যখন শুনলেন যে মেয়ের গা থেকে সব গয়না খুলে নেওয়া হয়েছে, রাগে তৎক্ষণাৎ তিনি নববধূকে সঙ্গে নিয়ে জয়রামবাটী ফিরলেন।

জননী চন্দ্রমণি দেবী শোকাতুর হয়ে পড়লেন।

গদাধর এবার মাকে সান্ত্বনা দেন, নিয়ে কোথায় যাবে ওরা ? ওরা যাই করুক না কেন, এ বিয়ে আর ফেরাতে পারবে না !

বালিকা বধূ নিয়মরক্ষার জন্যে আর একবার মাত্র কামারপুকুরে এসেছিলেন, দু'এক দিনের জন্যে। তারপর, গদাধর ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে, সারদামণি ফিরে গেলেন জয়রামবাটীতে।

মাটীর তলায় বীজ অপেক্ষা করে রইলো অঙ্কুরোদ্গমের মহা-লগ্নের জন্যে। তাড়াহুড়ো নেই, তাগিদ নেই, এ বীজের সবুর সয়।

১০

গদাধর ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে···

পেছনে পড়ে রইলো কামারপুকুর, জয়রামবাটী, বালিকা-বধূ···যেন অন্য কোন জন্মে অন্য কোন জীবন···

খণ্ড-পাওয়ার সেই খাণ্ডব-দহন-জ্বালা জ্বলে ওঠে আবার মেঘস্পর্শী শিখায়। সে-শিখায় ছাই হয়ে পুড়ে যায় সব বিষয়-চেতনা, বস্তু-ভাবনা।

একা চলে পথিক আত্মার সুমেরু শিখরের দিকে, যেখানে আজও পর্যন্ত পড়েনি মানুষের পায়ের চিহ্ন…

নানাদিক থেকে নানা পথ চলে গিয়েছে সেই মহাবিন্দুর দিকে

তারা কি সবাই গিয়ে শেষ হয়েছে সেই মহাবিন্দুতে ?

উন্মাদ বলে, প্রত্যেক পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে দেখবো, কোথায় গিয়ে তারা সব মিলেছে মিশেছে…

জয়রামবাটীর পুকুর-ধারে, খেজুর-গাছতলায় পৌঁছয় না তার কোন সংবাদ।

সেই ছোট্ট পরিসরের মধ্যে সারদামণি বাংলা গ্রামের সাধারণ গৃহস্থের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের চক্রে নিশ্চিন্ত স্বাতন্ত্র্যে একা ঘুরে বেড়ান। এই পৃথিবীতে কোথাও এমন একজন কেহ আছেন, যাঁর জন্যে তাঁর মাথায় সিঁদুরের লাল রেখা। তার বেশী কোন চিন্তা বালিকার মনে স্থান পায় না।

১১

মাতা অসুস্থ। সংসারের সব রান্না বালিকা সারদামণিকেই করতে হয়। বিপদ হয়, ভাতের হাঁড়ি নামাবার সময়। বাধ্য হয়েই তখন বালিকা পিতাকে ডাকে। পিতা এসে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দেন। অন্য সব রান্না বালিকাই শেষ করে।

মনে পড়ে যায়, ক্ষেতে 'মুনিষ'রা কাজ করছে, তাদের জলখাবার দিতে হবে। মুড়ি-গুড় নিয়ে বালিকা ক্ষেতের দিকে চলে। নিজে দাঁড়িয়ে তাদের খাইয়ে আবার বাড়ী ফেরে। কিন্তু কাজের কি বিরাম আছে? গরুদের জন্যে দলঘাস জোগাড় করতে হবে। পুকুর-ধারে এসে এক বুক জলে নেমে পড়ে। সেখান থেকে দলঘাস কেটে আঁটি বোঝাই করে গোয়ালঘরে ফিরে আসে। দুপুরবেলা বাড়ীর সকলকে খাইয়ে তবে বালিকা নিজে খায়। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আবার ছোটে পাশের বাগানে, গাছ থেকে তুলো পেড়ে আনে। দাওয়ায় বসে ছোট্ট ছোট্ট আঙুল দিয়ে সেই তুলো থেকে পৈতা তৈরী করে। পৈতা তৈরী হয়ে গেলে, ছোট ছোট ভাই-বোনদের তদারক করা আছে। বালিকা হলে কি হবে, তিনি যে বড়দি। কখন কখন ছোট্ট ভাইটীর সঙ্গে পাঠশালায় গিয়ে চুপটী করে বসেন। ভাইটীর সঙ্গে সঙ্গে একটু-আধটু পড়তে শেখেন। পড়তে খুব ইচ্ছা যায় কিন্তু লজ্জায় সে-কথা মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেন না।

এমন সময় একদিন কোথা থেকে এলো পঙ্গপাল। ভরা-ক্ষেতের সব শস্য কেটে নষ্ট করে দিয়ে গেল। চারিদিকে উঠলো দুর্ভিক্ষের হাহাকার। পড়সী মেয়েদের সঙ্গে দল বেঁধে চল্লেন ক্ষেতে। মাটী থেকে একটী একটী করে লক্ষ্মীর ধন কুড়িয়ে তোলেন। আহা, এক মুঠো এই অন্নের অভাবে মানুষ নাকি শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। সারদামণি চোখের সামনে দুর্ভিক্ষের সেই ভয়াল মূর্তি দেখে শিউরে উঠলেন। দলে দলে কোথা থেকে সব ক্ষুধাতুর লোক তাঁদের বাড়ীর সামনে এসে জড় হয়।

"আমাদের আগের বছরের ধান মরাই-বাঁধা ছিল। বাবা সেই সব ধান চাল করিয়ে কলায়ের ডাল দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ী রাঁধিয়ে রাখতেন। বলতেন, এই বাড়ীর সবাই খাবে, আর যে আসবে তাকেও দেবে। আমার সারদার জন্যে খালি ভাল চালের দুটী ভাত করবে, সে আমার তাই খাবে। এক একদিন এমন হ'ত, এত লোক এসে পড়তো যে খিচুড়ীতে কুলোতো না। তখন আবার চড়ান হতো। আর সেই গরম খিচুড়ি যেই ঢেলে দিত, শিগগির জুড়োবে বলে আমি দু'হাতে বাতাস কত্তুম! আহা! ক্ষিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্যে বসে আছে।" *

নিজের ছোট্ট আবেষ্টনীর মধ্যে বাংলা গ্রামের প্রতিদিনের হাসি-কান্নার সুপরিচিত জীবনে বালিকার দিন চলে যায়···কোথায় দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে তাঁর স্বামী কি কঠোর সাধনার অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন, তার কোন ধারণাই কল্পনাতেও তাঁর মনে জাগে না।

পরিচয়হীন দুই পর্বতচূড়া থেকে যেন দুটী বিভিন্ন স্রোতধারা আপনার অজ্ঞাতে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে···কোন্‌খানে কোথায় এসে কবে সেই দুই ধারা যে এক হয়ে মিশে যাবে, কেউ তা জানে না।

৭২

বিয়ের পর সাতবছর বয়সের সময় সারদামণি একবার মাত্র স্বামীর একটুখানি দেখা পেয়েছিলেন···

---

* মায়ের আত্মকথা থেকে

ভাগ্নে হৃদয়ের সঙ্গে রামকৃষ্ণ জয়রামবাটীতে গিয়েছিলেন।

শুধু মনে আছে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ভাগ্নে হৃদয় সারা বাড়ী খুঁজে বেড়ান। শেষকালে দেখতে পান, সাত বছরের ছোট্ট মামীটি ভয়ে লজ্জায় বাড়ীর এক কোণে নিভৃতে লুকিয়ে আছেন।

একরাশ পদ্মফুল হাতে নিয়ে হৃদয় সেই বিমূঢ়া বালিকার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেন···পাথরের মত স্থির হয়ে বালিকা সেই অদ্ভুত সম্ভাষণের কোন অর্থ খুঁজে বার করতে পাবে না। মনের কোণে রয়ে যায় সেই অপূর্ব বিস্ময়।

তারপর চলে যায় দীর্ঘ ছ'বৎসর। বালিকা আজ ত্রয়োদশী, কৌতুক-জাগ্রতা কিশোরী।

সেই সময় আর একবার এলেন শ্বশুর বাড়ীতে···একমাস রইলেন। কিন্তু দেখা হলো না সেই অদ্ভুত স্বামীটির সঙ্গে। তার মাস ছয়েক পরে আবার কিছুদিনের জন্যে এলেন কামারপুকুরে। সেবার দেড়মাস রইলেন। কিন্তু কোথায় স্বামী? লজ্জাশীলা কিশোরী গ্রাম্য-বধূ উৎকর্ণ হয়ে শোনে কে কোথায় তার স্বামী সম্বন্ধে কি বলছেন। যা শোনেন, তা থেকে কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। অন্তরে ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে, অপার কৌতূহল···কিন্তু বাইরে তার নেই কোন প্রকাশ। মাটীর তলায় এতদিন যে বীজ সুপ্ত হয়ে ছিল, একটু একটু করে তার মধ্যে দেখা দেয় আত্মবিস্তারের লক্ষণ। কবে আসবে সে-লগ্ন যেদিন বীজ নিজেকে বিদীর্ণ করে জন্ম দেবে অঙ্কুরকে? ধরিত্রী তার নিজের অতল অন্ধকারের স্নেহ দিয়ে মহাধৈর্যে রক্ষা করে সে-প্রাণ-বীজকে···লক্ষ অপব্যয়ের মধ্যে একটী মহাসম্ভাবনা···

সেবায় দেড়মাস কামারপুকুরে বাস করার পর সারদামণি আবার ফিরে এলেন জয়রামবাটীতে।

আজ বালিকা পূর্ণা কিশোরী···চতুর্দশী।

এমন সময় একদিন সংবাদ এলো, এসেছে আহ্বান, এসেছেন স্বামী···অপেক্ষা করে আছেন তাঁরি মিলনের জন্য। বীজকে বিদীর্ণ করে এসেছে অঙ্কুরোদগমের মহালগ্ন।

কামারপুকুর থেকে লোক এলো তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে।

১৩

আজ আর নেই তরঙ্গের আলোড়ন···অন্তরের বিক্ষোভ···পাওয়া-আর-না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব। ভিতর বাহির পূর্ণ করে দেখা দিয়েছে সাধনার অমৃতফল···দিব্য-দৃষ্টি। আজ তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস। অদ্বৈতবাদী গুরু মুক্তপুরুষ তোতা-পুরীর কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন সন্ন্যাসে দীক্ষা···দিব্য-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন, এই বিরাট সৃষ্টির অন্তর্লীন রহস্য।

দীক্ষার পর একদিন সন্ন্যাসী-শিষ্যের মুখে গুরু শুনলেন যে তিনি বিবাহিত!

ব্রহ্মবিদ্ গুরু বলেন, এতে কিছুই যায় আসে না। যিনি জানতে পেরেছেন, এই সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে সবই সেই ব্রহ্মের স্বরূপ, তাঁর কাছে নারী ও পুরুষের যৌন-ভেদ কোথায়? ভগবানকে ভালবাসার আসল পরীক্ষা হলো সেখানে···যেখানে নারীকে পাশে রেখেও মনে আসঙ্গ-লিপ্সার চিন্তা পর্যন্ত উদিত হয় না।

গুরুর সেই মন্ত্র শিষ্য সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেন। মন্ত্র মূল্যহীন যদি না তা জীবনে হয় প্রতিষ্ঠিত।

তাই এতদিন পরে রামকৃষ্ণ ফিরে চাইলেন পেছন দিকে, যেখানে জড়পুত্তলির মত দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ বছরের বালিকা বধূ। আজ এসেছে লগ্ন, সেদিন অগ্নি সাক্ষী করে, যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তাকে সার্থক করে তুলতে। যে বালিকাকে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন পত্নীরূপে, পত্নী ও নারীরূপে তাঁকে দিতে হবে যোগ্য মর্যাদা।

অগ্নি সাক্ষী করে যে সত্য গ্রহণ করেছিলেন, তাকে প্রত্যাখ্যান করে নয়, তাকে পালন করেই, মর্যাদা দিতে হবে জীবন-সমন্বয়ের।

তাই সেদিন আজন্ম ব্রহ্মচারী মন্ত্রদীক্ষিত সন্ন্যাসী নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের পূর্ণ মর্যাদা দিতে কামারপুকুরের দিকে যাত্রা করলেন।

নর-নারী-সম্পর্কের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব বিচিত্রসুন্দর অধ্যায়।

১৪

বহুদিন পরে আবার পরমহংসদেব যখন স্বেচ্ছায় কামারপুকুরে এসে উপস্থিত হলেন, আত্মীয় স্বজনের আনন্দ আর ধরে না। তাঁরা স্থির করলেন, এই আনন্দের পাত্র পূর্ণ করবার জন্যে তরুণী বধূকে নিয়ে আসা কর্তব্য।

রামকৃষ্ণ আনন্দে সম্মতি দিলেন।

শুধু কল্পনায় অনুভব করা যায়, কি আবেগ-কম্পিত হৃদয়ে সেদিন সারদামণি কামারপুকুরে এসেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে স্বামীর সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম পরিচয়।

সন্ন্যাসী স্বামী, না জানি হয়ত দেখে বিরূপ হবেন, হয়ত তাঁর সঙ্গ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন··হয়ত অশিক্ষিত গ্রাম্য বালিকা বলে উপেক্ষা করবেন···কিম্বা হয়ত তাঁরই মতন সন্ন্যাস নিতে বলবেন···

কম্পিত ভীরু তরুণী বধূকে এমন সহজ আন্তরিকতায় একেবারে কাছে টেনে নিলেন যেন জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত···ধর্মের কোন বড় বড় তত্ত্বকথা বল্লেন না···মন্ত্র, দীক্ষা, সন্ন্যাস কিছুই নয়···সংসারে থাকতে হলে সংসারের প্রতিটী কর্তব্য কি করে সম্পন্ন করতে হয়··· অতিথি সৎকার থেকে প্রদীপে সল্‌তে তৈরী করা পর্যন্ত···প্রত্যেকটী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্তব্য একান্ত সংসার-অভিজ্ঞের মত নিজে হাতে করে দিনের পর দিন শেখাতে লাগলেন। এক একটা দিন যেন এক একটা ফুলের মত ফুটে উঠতে লাগলো। ধাপের পর ধাপ বাইরের কর্তব্য থেকে ক্রমশ অন্তরের দায়িত্বে সজাগ করে তোলেন। সেই বিস্মিতা তরুণীর অন্তরে এক নতুন পৃথিবী স্তরের পর স্তর গড়ে উঠতে থাকে। পূজার অর্ঘ্যের মতন তিনি নিজের অন্তরকে সেই অপরূপ দেবতার সামনে তুলে ধরেন। নিজে জানবার আগে, দেখেন কখন তাঁর সত্তাকে সেই প্রেমময় যাদুকর সম্পূর্ণ তাঁর নিজের করে নিয়েছেন। সেখানে দেহ ও মনের সীমারেখা কোথায় এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে যে, তার বোধ পর্যন্ত অন্তরে নেই। সাত মাস পরে যখন রামকৃষ্ণ বিদায় নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন, বাইরের জগৎ না জানলেও, তরুণীর অন্তরে তখন এক মহাপ্রলয় ঘটে গিয়েছে। জগৎ যেখানে দেখলো স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, তিনি নিজে সেখানে দেখলেন, বাইরের বিরাট বিশ্ব থেকে স্বামী তাঁর অন্তর জুড়ে বসে

রইলেন। তাই স্বামীকে বিদায় দিতে গিয়ে দেখেন, "হৃদয়-মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে···ঐকাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর পূর্ণ থাকিত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়।" *

১৫

সেই মহাজ্যোতির দিব্য-স্পর্শ অন্তরে সংগোপনে বহন করে সারদামণি জয়রামবাটীতে আবার ফিরে এলেন। কিন্তু মন তাঁর সেই অপরূপ স্বামীর অদৃশ্য পদাঙ্ক অনুসরণ করে দক্ষিণেশ্বরের দিকে চেয়ে রইলো। মাটীর তলায় সংগোপন-রসে নিঃশব্দে পরিপুষ্ট হয়ে যেমন মেঘের দিকে মাথাতুলে জেগে ওঠে মহীরুহ, তেমনি লোকচক্ষুর অন্তরালে নিঃশব্দে সেই দিব্য প্রেমের স্পর্শে জেগে ওঠে সেই অশিক্ষিত গ্রাম্য বালিকার অন্তরে এক অভিনব নারীত্ব···যা একদিন দেহগত ক্ষুদ্রতা, গ্রাম্যতা, সংস্কার ও নারী-গত সব সীমাবদ্ধতাকে তুচ্ছ করে সজ্ঞানে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের আত্মার পরমাত্মীয়রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল।

কিন্তু সেদিন জয়রামবাটীতে যেসব আত্মীয়াদের মধ্যে সদ্য-স্বামী-গৃহ-প্রত্যাগতা তরুণী বধূকে ঘুরে বেড়াতে হতো, তারা এই অন্তরের অন্তরঙ্গ সংবাদের কোন ধার ধারতো না।

আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারি, স্নানের ঘাটে, পূজার মন্দিরে, নিমন্ত্রণ-সভায় তাঁরা সারদামণিকে যে-সব জাগতিক এবং

* শ্রীমার আত্মউক্তি

অতি-গতানুগতিক সব প্রশ্ন করতেন এবং যখন তাঁদের অভিজ্ঞতা-মত কোন সদুত্তর পেতেন না, তখন তাঁরা কৃপা-পরবশ হয়েই বলতেন, আহা, বেচারা…পাগলের বউ কি না! স্বামী কি বস্তু, জানতে পারলে না!

সেই অযাচিত কৃপা-বর্ষণে সারদামণি বাইরে কাউকে কিছু বলতে না পারলেও মনে মনে ব্যথাতুর হয়ে উঠতেন। ক্রমশ তাঁর ডাক-নামই যেন হয়ে গেল, পাগলের বউ। কেউ না জানলেও, তিনি তো জানেন, কি বিরাট প্রেমের স্পর্শ তিনি পেয়েছেন। তাই স্বামী-নিন্দা যাতে না শুনতে হয়, তার জন্যে তিনি পথে-ঘাটে বেরুনো, প্রতিবেশিনীদের বাড়ীতে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলেন। তার ফলে, অষ্টপ্রহর সেই দিব্য-স্মৃতি অন্তরকে আচ্ছন্ন করে থাকে…জগৎ হয়ে ওঠে মনময়। ক্বচিৎ কখনো মন যখন বড় উতলা হয়ে ওঠে, ভানু পিসীর ঘরের বারান্দায় গিয়ে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে থাকেন। ভক্তিমতী ভানু পিসী অযথা প্রশ্নে তাঁকে উত্যক্ত করেন না।

কিন্তু ক্রমশ সে-বিরহ অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। মুখ ফুটে লজ্জায় সেকথা কাউকে বলা যায় না। ভেতরে যেন আগুন জ্বলতে থাকে। কিন্তু তিনি জানেন, এত ভালবাসা যিনি অকাতরে দিয়েছেন, তিনি কখনো তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেন না। আজ না হয় কাল, নিশ্চয়ই তিনি ডেকে পাঠাবেন…আবার সেই জ্যোতির স্পর্শে আলোময় হয়ে উঠবে সব। সেই সাত মাসের স্মৃতি অসম্ভব আশার মতন অন্তরের সব ব্যথার ওপরে দেয় সান্ত্বনা।

যত দিন যায়, ততই আত্মীয়স্বজনেরা হতাশ হয়ে উঠতে থাকে। কেউ কেউ গায়ে পড়ে তাঁর সম্ভাব্য দুর্ভাগ্যের কথা তাঁকে শুনিয়ে যায়। তবু তাঁর অন্তরে কে যেন বলে, "যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার!"

কিন্তু হায় দেখতে দেখতে এক বছর, দু'বছর কেটে গেল। কোন সংবাদ নেই। সারদামণির অন্তরের বিরহ-সাগর ক্রমশ তরঙ্গ-উদ্বেল হয়ে উঠতে থাকে। দেখতে দেখতে তিন বছরও প্রায় কেটে যায়। সারাক্ষণ চেতনায় যিনি জাগ্রত রয়েছেন, বাইরে কেন তিনি এত দূরে থাকবেন? মনে হয়, যেন কি এক তীব্র আকর্ষণ তাঁকে অহরহ টানছে··· অথচ তিনি এক-পা'ও নড়তে পারছেন না। ক্রমশ অসহ্য হয়ে ওঠে সেই দিন-দিন প্রতীক্ষা! দেবতা যদি না আসে, আমি যাব দেবতার কাছে···লোকে তো তীর্থে যায়! আমিও যাব আমার শ্রেষ্ঠ তীর্থে···

সে বছর * ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গ্রামের কয়েক ঘর আত্মীয় কলকাতায় যাচ্ছেন গঙ্গাস্নানে। সারদামণি তাঁদের কাছে জানালেন, তাঁরও বড় সাধ গঙ্গাস্নানে কলকাতায় যাবেন। কলকাতায় যেতে হলে, পথে তো দক্ষিণেশ্বর পড়বে! তাঁরা রামচন্দ্রকে জানালেন। কন্যাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে রামচন্দ্র নিজে কন্যাকে নিয়ে যেতে রাজী হলেন। যথাকালে যাত্রীর দল পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লো।

কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতে সারদামণি বুঝলেন, পায়ে হেঁটে এই দূরপথ অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। একদিনের পথ কোন রকমে চলে আসার পর দ্বিতীয় দিন হাঁটতে গিয়ে সারদামণি দেখলেন পথের কাঁটায় আর কাঁকরে তাঁর পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা কাউকেই জানালেন না। তাঁর জন্যে কেন সবাই অসুবিধা ভোগ করবে? সেই ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে তিনি তিন দিনের পথ হেঁটে এলেন কিন্তু দেহ তো মন নয়। দেখতে দেখতে পথের

* ১২৭৮ সাল

মধ্যেই প্রবল জ্বর দেখা দিল। বাধ্য হয়ে রামচন্দ্র কন্যাকে নিয়ে এক চটীতে আশ্রয় নিলেন।

সেই প্রবল জ্বরের মধ্যে সারদামণির অন্তর ব্যথায় ভেঙ্গে পড়লো। হায় দেবতা! তবে কি তুমি দূরেই রইলে?

জ্বর এবং শরীরের অসহ্য ব্যথায় তিনি অচৈতন্য হয়ে শুয়ে পড়লেন। তন্দ্রার মধ্যে দেখেন, "পার্শ্বে একজন রমণী আসিয়া বসিল·· মেয়েটীর রঙ কালো কিন্তু এমন সুন্দর রূপ আর দেখি নাই। বসিয়া আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কোথা থেকে আসছো গা? রমণী বলিল, আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি। শুনিয়া অবাক হইয়া বলিলাম, দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে দেখবো, সেবা করবো··· রমণী বলিল, সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বৈ কি!"

পরের দিন সকাল বেলা জ্বর ছেড়ে গেল। রাত্রির সেই স্বপ্নের কথা মনে নতুন করে এনে দিয়েছে আশা। পিতার সঙ্গে আবার তিনি হাঁটতে সুরু করলেন। ভাগ্যক্রমে কিছু দূর যেতে না যেতে একটা পাল্কী পাওয়া গেল। রামচন্দ্র সেই পাল্কী ভাড়া করলেন। পাল্কীতে উঠে সারদামণি বুঝলেন, আবার জ্বর এসেছে। কিন্তু সেকথা আর পিতাকে জানালেন না। যদি আবার বিলম্ব হয়ে যায়।

রাত ন'টার সময় পিতার সঙ্গে সারদামণি দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌছলেন।

উপল-বিক্ষত প্রান্তর অতিক্রম করে স্রোতস্বিনী সাগরে এসে পড়লো।

১৬

অন্তরের আকর্ষণে ভক্ত এসেছে ভগবানের কাছে।

ভগবান তাই ভক্ত হয়ে দেন তার মান।

নিজের ঘরের মধ্যে, তাঁর শয্যার পাশাপাশি স্বতন্ত্র এক বিছানা ঠাকুর তাড়াতাড়ি পাতার বন্দোবস্ত করেন! শিশুর মত ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। যদি ঠাণ্ডা লেগে জ্বর বেড়ে যায়।

নিজের হাতে রোগিণীর সেবা করেন। সেবা করেন আর বলেন, এতদিনে তুমি এলে? আর কি আমার সেজবাবু (মথুরবাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে?

সারদামণি বিস্মিত-আনন্দে ভাবেন, কে বলে তিন বৎসর অদর্শন হয়েছিল?

অমৃত-রসে আপ্লুত হয়ে যায় মন। এ প্রেমে কোথায় বিচ্ছেদ?

১৭

তিন দিন সেবা-যত্নে সারদামণি আরোগ্য লাভ করে উঠলেন।

এই তিন দিন তিনি ঠাকুরের ঘরেই রইলেন।

সেরে ওঠার পর নহবৎ-ঘরে ঠাকুর তাঁর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করে দিলেন সেখানে তখন চন্দ্রমণি দেবী বাস করছিলেন।

এতদিন পরে নিজেকে বিস্তার করবার সুযোগ পেয়ে সারদামণি আনন্দে ভরে উঠলেন। নারী জীবনের মূল-সূত্রের পরিচয় তিনি কামারপুকুরে সেই সাতমাসের শিক্ষায় স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। কি সাধনায় তাঁর স্বামী জীবন উৎসর্গ করেছেন, তার সঠিক ধর্ম তখনও পর্যন্ত উপলব্ধি করতে না পারলেও, সেই অল্প বয়সেই তিনি এটুকু বুঝেছিলেন যে, স্বামীর সাধনায় স্বামীকে সাহায্য করাই তাঁর জীবনের ব্রত। যে-পথে তাঁর স্বামী যাত্রা করেছেন, সে-পথে যেন বিন্দুমাত্র বিঘ্ন তার দিক থেকে না আসে। এ যে কত বড় দায়িত্ব, সেদিন তিনি হয়ত বুদ্ধি দিয়ে তা উপলব্ধি করেন নি, কিন্তু অন্তরের সহজাত প্রেম-ধর্ম বুদ্ধির চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী। এবং সেদিন তথাকথিত অশিক্ষিতা এই গ্রাম্য নারী যে-ভাবে ঠাকুরের সেই সময়কার অলৌকিক জীবনের মহাদ্বন্দ্বের পাশাপাশি থেকে, নিজেকে ক্ষণকালের জন্যেও সামনে না এনে, নিঃশব্দে নীরবে সেই মহাজীবনকে সম্পূর্ণ হতে সহায়তা করেছিলেন, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বহুযুগের অযত্ন আর উদাসীনতা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের মেয়ের অন্তরের ঐশ্বর্য্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি এবং সে ঐশ্বর্য্য বিধাতার দুর্লভ দানস্বরূপ এই হতভাগ্য জাতিকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু অব্যবহারে, অপব্যবহারে এবং বহুক্ষেত্রে তার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে না পেরে এই দুর্লভ জাতীয় সম্পদকে আমরা আবর্জনা-স্তূপে পরিণত করতে চলেছি। যা দিয়ে বজ্র তৈরী হতে পারতো, তা দিয়ে আমরা খেলনা তৈরী করছি। মহাশক্তির এই বিদ্যুৎ-প্রভা আমাদের জাতীয় জীবনের আকাশে শুধু নিরর্থক মেঘে মেঘে ঘর্ষণে নিঃশেষিত হয়ে যেতে চলেছে, তা থেকে আমরা বিশ্ব-বিজয়িনী আলোক-শক্তি সংগ্রহ করতে পারলাম না। এই বিরাট অপব্যয় জাতির ভাগ্যবিধাতা কোনদিনই ক্ষমা করবেন না।

সারদামণির আগমনকে ঠাকুর তাঁর নিজের দিক থেকে বিধাতার নির্দেশ বলে গ্রহণ করলেন। কারণ, জীবনে ব্রহ্মচর্যের যে আদর্শ গ্রহণ করেছেন, বাস্তব জীবনে তার পরীক্ষা হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তাই তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলেন এই ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা। দেহকে অবলম্বন করে দেহাতীত হওয়ার সুকঠোর ব্রত। মনে যদি যৌন-বাসনার বিন্দুমাত্র বোধ জন্মায়, তাহলে বাইরের দৈহিক ব্রহ্মচর্যের কোন মূল্য থাকে না।

সুরু হলো এক নতুন সাধনা···বহু-সাধনাময় জীবনের শেষ সাধনা··· নর-নারীর মিলন-ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

আজন্ম ব্রহ্মচারী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী রাত্রিতে নিজের নিঃসঙ্গ ঘরে এক শয্যায় বরণ করে নিলেন অষ্টাদশী তরুণী পত্নীকে।

১৮

আনন্দময় ঠাকুর পত্নীকে নিভৃতে পেয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি গো, কি মনে করে এলে? আমাকে সংসারের পথে টেনে আনতে?

ইষ্ট-দেবতার দিকে চেয়ে নারী বলে, না···আমি এসেছি তোমার ইষ্ট-পথে তোমাকে সাহায্য করতেই!

তার বেশী কোন অধিকার তিনি চাইলেন না। এমন কি তাঁর সেবার অধিকারও না। যতটুকু অধিকার তিনি স্বেচ্ছায় দেবেন, তাতেই তিনি পরিতৃপ্ত। প্রাণের ক্ষেত্রে চেয়ে-নেওয়ার অপেক্ষা আপনা থেকে পাওয়াই যে চরম পাওয়া, সারদামণি অন্তর-ধর্মে তা উপলব্ধি করেছিলেন।

নিঃশব্দ ছায়ার মতন সেই বিরাট জীবনের আড়ালে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত করে দিলেন। দক্ষিণেশ্বরে কেউ জানতেও পারলো না যে, সেখানে আর একটী প্রাণী এসে বাস করছে। এই কলরবহীন সজ্ঞান আত্ম-অবলুপ্তি গতানুগতিক নিষ্ক্রিয় দাসীত্ব নয়, আধুনিক মতে নারীত্বের অধিকারের বিসর্জনও নয়, এর পেছনে যে বিরাট চরিত্রশক্তি ও ব্যক্তিত্ব-বোধ আছে, তা বুঝতে না পেরেই অনেকে ভারত-নারীর এই বৈশিষ্ট্যের অপব্যাখ্যা করেছেন।

দিনের বেলা নহবৎ-ঘরে থাকেন, রাত্রিতে ঠাকুরের ঘরে আসেন। ঠাকুরের পাশে একই শয্যাতে শয়ন করেন।

শয়ন করেন কিন্তু ঘুম হয় না। দেহের এত কাছে যে মানুষ রয়েছে, তার নাগাল কিন্তু তিনি পান না কেন? কখনও হাসছেন, কখনও কাঁদছেন, কখনও বা একেবারে পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে যাচ্ছেন। স্পর্শাতীত কোন্ দূরলোকে তিনি চলে যান, সারদামণি তার কোন ধ্যান-ধারণাই করতে পারেন না। কিন্তু পাছে অজ্ঞাতে কোন অন্যায় করে ফেলেন সেই ভয়ে নিদ্রাহীন বিস্ময়ে জেগে থাকেন...

ভোর হয়ে যায়...কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আবার নহবৎ-ঘরে ফিরে আসেন।

কোন কোন রাত্রিতে পরম আদরে তাঁকে শিক্ষা দেন...জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে...প্রদীপে কিভাবে শলতে রাখতে হয়... বাড়ীর কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়...আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে বেড়াতে গেলে কি করতে হয়...

ক্রমশ শিক্ষার বিষয় সাংসারিক পরিধি অতিক্রম করে ধীরে ধীরে আত্মিক-স্তরে উন্নীত হতে থাকে···জীবন ও জীবনাতীত সম্বন্ধে যে বিপুল রহস্য এতদিন তাঁর ধ্যান ধারণার বাইরে ছিল, সেই অপরূপ গুরুর মুখে একে একে তার পরিচয় পান।

কিন্তু তখন তিনি ধারণাই করতে পারতেন না, তাঁর শয্যাসঙ্গী সেই মহাপুরুষের অন্তরে চলেছে কি বিপুল আলোড়ন। মহা-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ঠাকুর তখন চলেছেন—তাঁর সাধনার শেষ তীর্থের দিকে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি দেখতে চান, এই মানুষের অন্তর দেহ-বোধের অতীত হতে পারে কি না। প্রত্যেক নারীর মধ্যে···বিশেষ করে যে-নারীকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করেছেন···তাঁর মধ্যেও সেই জগন্মাতার রূপ তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে চান। চরম অদ্বৈতবাদী, শুধু জ্ঞানে নয়, জীবনের প্রতি কর্মে সেই মহাসত্যকে তিনি উপলব্ধি করবেন। পুঁথির আকাশ থেকে ধর্মকে টেনে এনে জীবনের মাটীর সঙ্গে তাকে দেবেন বেঁধে।

তাই ক্ষণে ক্ষণে ভাব-সমাধিতে তখন দেহ ও দেহ-বোধের ঊর্ধ্বে প্রয়াণ করেন। সারদামণি ভীত হয়ে পড়েন। মনে মনে প্রার্থনা করেন, কখন রাত্রি শেষ হবে।

এক রাত্রিতে তিনি এত ভীত হয়ে পড়লেন যে, স্বাভাবিক লজ্জা ভুলে গিয়ে, সেই রাত্রিতেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে ভাগ্নে হৃদয়কে ঘুম থেকে ডেকে তুল্লেন। সমাধিস্থ সেই প্রস্তর-মূর্তির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়···রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসে, অথচ সেই নিশ্চল দেহে প্রাণের কোন লক্ষণই প্রকাশ

পায় না। মহা আশঙ্কায় তাই ছুটে গিয়ে হৃদয়কে ডেকে আনেন। হৃদয় এসে কানে কানে নাম-মন্ত্র জপ করার পর ধীরে ধীরে ঠাকুর সমাধি ভেঙ্গে আবার জেগে উঠেন।

এই ঘটনার পর থেকে ঠাকুর সেই রহস্যময় ভাব-রাজ্যে প্রবেশ করবার পথ পথসঙ্গিনীকে প্রিয়শিষ্যের মত দেখিয়ে দিতে লাগলেন। ধীরে ধীরে এক নতুন পৃথিবীর তটরেখা সারদামণির বিস্মিত নয়নের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে থাকে···প্রভাতের পৃথিবীর মত উন্মুখ আগ্রহে চেয়ে থাকেন সেই পরম-অভ্যুদয়ের দিকে···

আত্মায় আত্মায় চলে অমৃত-ভোগ!

সার্থক হয়ে ওঠে বিবাহের মন্ত্র।

১৯

দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত যাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

নারী-যাত্রীদের অনেকেই নহবৎ-ঘরে মার সঙ্গে দেখা করে যায়।

স্বামী-স্ত্রীর এই অদ্ভুত সম্পর্ক তারা বুঝতে পারে না। স্বভাবতই তাই মাকে তারা বলে, হাঁগা, একটা ছেলে না হলে কি মেয়েমানুষকে মানায়!

তাদের সেই যুক্তি শুনতে শুনতে স্বভাবতই সেই একান্ত সরল-প্রাণ গ্রাম্য যুবতীর মনে বাৎসল্য-রসের তৃষ্ণা জেগে ওঠে।

একদিন তাই ঠাকুরকে তিনি অকুণ্ঠভাবেই বলে বসলেন, তাই তো ছেলেপুলে একটা হবে নি···সংসার-ধর্ম বজায় থাকবে কিসে?

ঠাকুর হেসে বলেন, একটা ছেলে খুঁজছো কি গো, তোমার এত ছেলে হবে যে তুমি মা-বোলে তিষ্ঠোতে পারবে না!

তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে মা সে-কথা আর কখনো উত্থাপন করেন নি। বোধ হয় আর কোন প্রার্থনাই মুখ ফুটে উচ্চারণ করেন নি। তিনি জানতেন, তাঁর কোন অভাবই অপূর্ণ রাখবেন না তাঁর ইষ্ট-দেবতা।

একদিন ঠাকুরের পদ-সেবা করতে করতে শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি তোমার কে?

জননী ভবতারিণীর মন্দিরের দিকে আঙুল দেখিয়ে ঠাকুর জবাব দেন, যে-মা ঐ মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন… আর সম্প্রতি নহবৎ-ঘরে বাস করছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন! সাক্ষাৎ আনন্দময়ী তুমি…সেই রূপেই তোমাকে নিত্য আমি দেখি!

এই দিব্যভাবে মাসের পর মাস চলে যায়।

একশয্যাতে রাত্রির পর রাত্রি একত্র বাস করার পরও যখন দেহ-বুদ্ধির সামান্যতম লক্ষণ তাঁর মনে দেখা দিল না, তখন সেই শেষ সাধনাকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে তিনি মনে এক অপরূপ পূজার আয়োজনের ব্যবস্থা ঠিক করলেন।

এই কঠোর সাধনার সর্ব-স্তরে তিনি সারদামণির আনন্দ-সম্মতি এবং সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন এবং পেয়েছেন। সেদিন যদি তাঁর সেই কঠোর দাবী পরিপূরণ করবার মত শক্তি বা ইচ্ছা সারদামণির না

থাকতো। যদি এই ইন্দ্রিয়-জয়ের দুঃসাধ্য মানবীয় পরীক্ষায়, যাঁকে পাশে নিয়ে এই পরীক্ষা করেছেন, সে-নারী যদি দেহ-বোধের ঊর্ধ্বে নিজেকে তুলতে না পারতেন, তাহলে যে কি হতো, তা বলা কঠিন। তাই জগৎ ঘোষণা করবে ঠাকুরের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার অপূর্ব কৃতিত্বের কথা···কিন্তু যে-নারী নিঃশব্দে নীরবে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে দিয়ে, এই অপূর্ব সাধনাকে সফল করে তুললো, তাঁর গৌরবের কথা হয়ত জগৎ ভুলেই যেতো, যদি না ঠাকুর নিজে সেই অপূর্ব নিঃশব্দ আত্মদানের মহিমা প্রচার করে যেতেন। আর ঠাকুর নিজে না বল্লে, এই একান্ত সংগোপন ব্যাপার সম্বন্ধে জগৎ জানতোই বা কি করে ?

তাই এই মহাপুরুষ, তাঁর সহধর্মিণীর এই বিরাট শক্তির কথা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তাঁর ভক্তদের কাছে বলেন, ও যদি ভাল না হত আত্মহারা হয়ে তখন আমাকে আক্রমণ করতো, তা হলে সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দেহ-বুদ্ধি আসতো কি-না, কে বলতে পারে ?*

২০

অমাবস্যা ···কালীপূজার রাত্রি···†

আজ রাত্রিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর জীবনের শেষ সাধনার ফল জগন্মাতার চরণে অর্পণ করবেন···

এই কয়েক মাস লোকচক্ষুর অন্তরালে যে মহাপরীক্ষায় তিনি ব্যাপৃত ছিলেন, আজ তার উদ্‌যাপন···

* লীলা-প্রসঙ্গ

† ১২৮০ সাল ১৩ই জ্যৈষ্ঠ

সকল নারী আজ তাঁর কাছে জগন্মাতার প্রতীক··মহাশক্তির আধার···তাই আজ সাক্ষাৎভাবে মাতৃমূর্তির স্থলে স্বীয় পত্নীকে প্রতিষ্ঠিত করে, অনন্ত ষোড়শীমূর্তি সেই মহাশক্তির আরাধনা করবেন···

এই মর্ত্য-জগতে নারী পাবে তার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য··স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে নর-নারীর সম্বন্ধের ইতিহাসে আজকের এই মহা-স্বীকৃতির কথা··

সারাদিন ধরে হৃদয় আর দীনু পূজারী একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্রসম্মত ভাবে ষোড়শী-পূজার সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করলেন··

ঠাকুরের নিজের ঘরে পূজার আসন প্রতিষ্ঠিত হলো···

আয়োজন সম্পূর্ণ হতে রাত্রি ন'টা বেজে গেল।

ঠাকুর পূজার জন্যে আসনে বসলেন। পূজার পূর্বকৃত্য সমাপন করে তিনি হৃদয়কে ইঙ্গিত করলেন, বিগ্রহকে নিয়ে আসতে।

হৃদয় কৃতাঞ্জলী-পুটে জীবন্ত বিগ্রহ-স্বরূপা সারদামণিকে আহ্বান করে নিয়ে এলেন।

পূজারীর ডানদিকে পূবদিকে মুখ করে আলিম্পন-আঁকা মন্ত্রপূত পীঠে বিগ্রহকে বসানো হলো···

মাটীর বিগ্রহ নয়···রক্তমাংসের জীবন্ত বিগ্রহ···

পূজারী, ভারতের তপ-শক্তির শেষ-প্রতিনিধি···ঠাকুর রামকৃষ্ণ···

পূজ্য দেবতা···নারী···তাঁরই পত্নী সারদামণি দেবী।

সামনে কলসী থেকে মন্ত্রপূত বারি নিয়ে পূজারী যথারীতি দেবতাকে অভিষিক্ত করলেন। যথারীতি মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাকে বরণ করলেন। তারপর শেষ প্রার্থনা মন্ত্রের সঙ্গে দেবীকে আহ্বান করলেন, "হে দেবী, হে চির-ষোড়শী, হে সব-শক্তির অধিশ্বরী, জগতের কল্যাণে সিদ্ধির দ্বার উন্মোচন কর···তোমার অসীম করুণায় এই সম্মুখস্থ বিগ্রহে তুমি আবির্ভূতা হও···"

বিগ্রহ তখন সমাধিস্থ!

পূজারীও বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত!

মন্ত্র নেই···তন্ত্র নেই···মহানীরবতায় চলে দুই আত্মার অমৃত-রমণ।

তৃতীয় প্রহর নিশায় পূজারীর বাহ্যজ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরে আসে··· দেবী তখনও আত্মার গভীরতায় প্রস্তর-স্থির।

ধীরে পূজা-অন্তে দেবীর চরণে তিনি নিজেকে নিবেদন করে দিলেন। বিল্ব-পত্রে নিজের নাম লিখে, পূর্ব-পর্ব সাধনকালে যে-সব বস্ত্র, আভরণ, রুদ্রাক্ষ, মালা প্রভৃতি ব্যবহার করেছিলেন, সে সমস্তই দেবীর চরণে সমর্পণ করে দিলেন। সেই সঙ্গে শেষ প্রার্থনায় নিজের সমস্ত সাধন-ফল দেবীকে নিবেদন করে দিলেন, হে মহাশক্তি, আজ তোমার চরণে আমার সব সাধনার ফল নিবেদন করে দিয়ে নিজেকে তোমার সঙ্গে দিলাম লীন করে!

বাইরে তখন পাণ্ডুর হয়ে আসছিল অমাবস্যা রাত্রির ঘন অন্ধকার।

মনে মনে পূজারীকে প্রণাম নিবেদন করে, সমাধি-অন্তে দেবী নীরবে নতমুখে চলে গেলেন নহবৎ-ঘরে।

জগতের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়ে গেল এই একটী অপূর্ব অমাবস্যার রাত।

২১

যে সম্মান জগতের কোন নারী কখনও পায়নি, সারদামণি ষোড়শী-পূজার রাত্রিতে বরেণ্য স্বামীর কাছ থেকে তা পেলেন।

মানবী-দেহে দেবীর পূজা গ্রহণ করলেন।

মাত্র কয়েকদিন আগে যিনি ছিলেন, সামান্য একজন গ্রাম্য রমণী, আজ পূজার চন্দনে, অর্ঘ্যের ফুলে, আর্য-ঋষির প্রাচীন মন্ত্রে তিনি শুনলেন, তিনি অসামান্যা, অদ্বিতীয়া, পরমারাধ্যা।

এক দেহে দুই সত্ত্বা, মানবী আর দেবী। সামান্যা ও অসামান্যা। সেবিকা আর সেবিতা।

কিন্তু সেবিতা পথ রোধ করে দাঁড়ালো না সেবিকার। অসামান্যা পূজার গর্বে বিস্মৃত হলো না সামান্যাকে। সম্রাজ্ঞী ভুলে গেল না সাধারণীকে। প্রতিমা নিজেকে উদ্ধত ঐশ্বর্য্যে মনে করলো না আরাধ্যা বলে।

সেদিন পরমহংসদেব নারীকে তার স্বর্গমহিমা দান করে, নিজের সাধনাকে করলেন সম্পূর্ণ। কিন্তু সেই নারী, সেদিনকার সেই ঐতিহাসিক মহা-সম্মান গ্রহণ করে নিজের ভার-কেন্দ্র থেকে যে এতটুকুও বিচ্যুত হলেন না, কতখানি মানসিক ঐশ্বর্য্য থাকলে এবং কতখানি সংস্কারগত শিক্ষা থাকলে যে তা সম্ভব, ভাবতে গেলে স্তম্ভিত হতে হয়।

সন্তান যিনি দিলেন, আর সেই সন্তান যিনি নিলেন, বিচার করে বলা শক্ত কে অধিকতর মহীয়ান্‌।

ষোড়শী-পূজার বাঁধন দেবী আবার বাঁধলেন। সেই পূজারিণী-মানবী নিঃশব্দচারিণী।

২২

হঠাৎ সমস্ত সংসারের ভার এসে পড়লো সদ্য-বিধবা শ্যামাসুন্দরীর ওপর সমস্ত সংসারকে অসহায় দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে স্বামী রামচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

দক্ষিণেশ্বর থেকে সারদামণি অসহায় জননীর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

ভায়েরা সব ছোট, নাবালক। কেবল বড় ভাই কলকাতায় গিয়ে যজন-যাজন করে সামান্য অর্থ উপার্জন করেন। তাতে তাঁরই চলে না।

গ্রামের মধ্যে বাড়ুজ্জেরা সঙ্গতিপন্ন। শ্যামাসুন্দরী তাদের বাড়ীতে ধানভানার কাজ নিলেন। এক আড়া ধান ভানলে চার কুড়ি ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ।

সারদামণি আনন্দে মার সঙ্গে ধান ভানতে বসেন।

মার সঙ্গে মাথা পেতে নেন সংসারের সব বোঝা।

সংসারের পথের প্রত্যেকটী কাঁকর মাড়িয়ে বীর নারীর মত মানবী এগিয়ে চলে তারই অন্তরবাসিনী দেবীর সিংহাসনের দিকে।

নিজের মধ্যেই রয়েছে নিজের মহা-প্রতিদ্বন্দ্বী। ঠাকুর করেছেন তাকে প্রতিষ্ঠা।

মহাপরীক্ষা।

২৩

এর মধ্যে আরও দু'একবার সারদামণি দক্ষিণেশ্বরে আসেন। কয়েকমাস বাস করবার পর আবার কামারপুকুরে ফিরে যান।

জয়রামবাটী···কামারপুকুর···দক্ষিণেশ্বর।

জয়রামবাটীতে তিনি কন্যা। বিধবা দরিদ্র মায়ের সহায়। কামারপুকুরে তিনি বধূ। সেখানকার সংসারেরও তাঁর ওপর আছে দাবী। দক্ষিণেশ্বর তাঁর তীর্থ। জীবনের চরম লক্ষ্য।

সংসারের আছে নিত্য প্রয়োজন···সে চায় বন্ধন।

তীর্থ কাউকে ডাকে না, কাউকে ধরে রাখে না। অদৃশ্য তার বন্ধন।

এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে ঘুরে বেড়ান সারদামণি।

ডাকবে না তীর্থের দেবতা?

কবে আসবে সেই লগ্ন?

২৪

সেবার প্রায় দেড় বৎসর কামারপুকুরে ছিলেন। ব্যস্ত সংসারের নিত্য কাজে…মন পড়ে থাকে দক্ষিণেশ্বরে।

হঠাৎ শুনলেন, গাঁয়ের ভূষণ মণ্ডলের মা, আরও কয়েকজন বর্ষীয়সী রমণী, গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন।

সেদিন গঙ্গাস্নানে যাওয়া ছিল গাঁয়ের জীবনের একটা মস্ত ঘটনা… বহু বৎসর বাদে এক-আধবার ঘটে।

সারদামণি সেই যাত্রীর দলে যোগদান করলেন। লক্ষ্য, দক্ষিণেশ্বর।

সঙ্গে ঠাকুরের ভাইজী লক্ষ্মী আর ভাইপো শিবরাম। চার ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে আরামবাগে এলেন। কথা ছিল আরামবাগের চটীতে রাত্রির মত বিশ্রাম করে, সকালবেলা আবার হাঁটতে সুরু করা হবে। কিন্তু আরামবাগে পৌঁছে দেখা গেল যে সামনে এখনও যথেষ্ট দিনের আলো রয়েছে। সহযাত্রীরা ঠিক করলেন যে আর সময় নষ্ট না করে হাঁটলেই দিনের আলো নিভবার আগেই তারকেশ্বরে পৌঁছন যাবে। এতখানি পথ হেঁটে এসে আবার হাঁটতে সারদামণির রীতিমত কষ্টকর মনে হলো। কিন্তু তাঁর নিজের জন্যে অপরকে বিব্রত করতে তিনি জানতেন না। তাই হাসিমুখেই রাজী হলেন।

সামনেই তেলো-ভোলার তেপান্তর মাঠ। ডাকাতের রাজত্ব। সেই মাঠ পেরিয়ে যেতে হবে তারকেশ্বরে।

কয়েক মাইল একসঙ্গে হাঁটার পর, সারদামণি ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে লাগলেন। ক্লান্ত চরণ ক্রমশ শ্লথগতি হয়ে আসে। সঙ্গীরা

প্রথম প্রথম মাঝপথে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু ক্রমশ তাঁরা বুঝতে পারেন, এই গতিতে চললে আজকে সন্ধ্যায় এই মাঠের মধ্যেই থেকে যেতে হবে। নিজের অসামর্থ্যে লজ্জিত হয়ে সারদামণি সঙ্গিনীদের বলেন, আমি ঠিক ঠিক পিছু পিছু যাব, আমার জন্যে আপনারা থামবেন না।

তাঁরা যত দ্রুত এগিয়ে চলেন, সারদামণি ততই পিছিয়ে পড়তে থাকেন। ক্রমশ তাঁর দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল সঙ্গিনীরা। আন্দাজে অগ্রসর হতে থাকেন। অজানা আশঙ্কায় মন কেঁপে ওঠে! দ্রুত চলতে থাকেন। ক্রমশ সন্দেহ জেগে ওঠে, ঠিক পথে কি চলেছেন? কতক্ষণ চলেছেন? দেখতে দেখতে তাল-নারকেলের মাথা থেকে ছায়া দীর্ঘতর হয়ে মাটিতে নামে। চারদিক থেকে দিনের আলো কুড়িয়ে এনে প্রান্তরব্যাপী অন্ধকারের জাল নিঃশব্দে কে গুটিয়ে তোলে… সারদামণি দেখেন, সেই ঘনায়মান অন্ধকারের জালে তিনি পড়ে গিয়েছেন একা…

ভয়ে কেঁপে ওঠে সর্বশরীর।

এমন সময় দেখেন, সামনে, দীর্ঘাকৃতি এক ভীমমূর্তি, অন্ধকারের মত গায়ের রঙ, হাতে দীর্ঘ এক লাঠী…তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে।

সারদামণি এক মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সম্বরণ করে নিলেন। পালাবার কোন চেষ্টা করলেন না। স্থির হয়ে সেই কৃষ্ণ-মূর্তির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

হাতে রূপোর বালা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লম্বা চুল, লোকটা কাছে এগিয়ে এসে বাঘের মত গর্জন করে উঠলো, কে তুই?

তারপর সম্ভ্রম-আতঙ্ক সেই যুবতীর মুখের দিকে চেয়ে, হঠাৎ তার সব কাজ কথা যেন বন্ধ হয়ে গেল এ রকম মুখতো এর আগে তার ডাকাতের জীবনে সে দেখেনি।

নীরব পায়ের মল খুলে ফেলে, তার হাতে তুলে দিতে গিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে সারদামণি ডাকলেন, বাবা!

কণ্ঠস্বরে ভয়ের কোন চিহ্ন নেই।

এই তেপান্তরের মাঠের অন্ধকারে তাকে দেখে ভয় করে না, এমন স্ত্রীলোক কি থাকতে পারে? ডাকাত বিস্মিত হয়ে ভাবে।

শান্ত বচনে সারদামণি মিনতি জানান, বাবা, সঙ্গীরা আমাকে ফেলে আগিয়ে চলে গিয়েছে। আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে থাকেন, তাঁর কাছে যাচ্ছি বাবা!

হঠাৎ এই স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকতায় আক্রান্ত হয়ে, আক্রমণকারী বিচলিত হয়ে ওঠে।

এমন সময় পেছন থেকে একজন নারী এসে সামনে দাঁড়ালে সারদামণি বুঝলেন, এ নারী নিশ্চয়ই এই ডাকাতের স্ত্রী।

তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সারদামণি অনায়াসে তার হাত নিজের হাতে টেনে তুলে নিয়ে, পরমাত্মীয়ের মত বলে উঠলেন, আমি তোমার মেয়ে, মা আমার নাম সারদা। উঃ, কি বিপদেই পড়েছিলুম মা, ভাগ্যিস বাবা আর তুমি এসে পড়লে।

দস্যু-পত্নীর মন গলে গেল।

দস্যুর মনে হলো হাতের লাঠী কে যেন তার হাত থেকে কেড়ে নিল। মনের গহন গভীরে সেই অকস্মাৎ পথ-থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া কন্যা-স্নেহ এক নিমেষে অঘটন ঘটিয়ে দিল।

—ভয় কি মা, চল আমাদের সঙ্গে!

কাছেই তেলো-ভোলা গ্রাম। সেখানে এক মুড়ি-মুড়কীর দোকানে সেই দস্যু-দম্পতী সারদামণিকে নিয়ে উপস্থিত হ'লো। দোকান থেকে মুড়ি-মুড়কী কিনে সেই বাগ্‌দী-দম্পতী সারদামণিকে খাওয়ালো। তারপর দোকানের একপাশে একটা ছোট্টঘরে সেই এক-রাত্রিরের বাগ্‌দী-মা নিজের কাপড়ের আঁচল বিছিয়ে দিল। সারদামণির ক্লান্ত দেহ নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় তার ওপর এলিয়ে পড়লো।

লাঠী হাতে দরজার বাইরে সারারাত সেই ডাকাতবাবা পাহারায় জেগে রইলো।

২৫

ভোর না হতেই সেই দোকানীর আশ্রয় ছেড়ে, তারা তারকেশ্বরের দিকে যাত্রা করলেন।

—চল্ মা, তোকে তারকেশ্বর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি!

পথের মধ্যে কড়াই ক্ষেত।

বাগ্‌দী-রমণী ক্ষেত থেকে কড়াই তুলে, নিজের হাতে ছাড়িয়ে সারদামণিকে খেতে দেয়। ছোট্ট মেয়েটির মত তাই খেতে খেতে সারদামণি এগিয়ে চলেন।

কি অঘটন ঘটে গেল, ডাকাতি করতে এসে, তার নিজের মনঃ গেল হারিয়ে। কে বলবে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে এই যে মেয়েটী চলেছে, এ তাদের নিজের মেয়ে নয়?

হাতের লাঠী হাতেই রইল, জয়ী হল সেই ব্রতীর অস্ত্রহীন আত্মনিবেদন ভয়হীন আত্মবিশ্বাস।

তারকেশ্বরে পৌঁছে সারদামণি দেখেন তাঁর সঙ্গিনীরা ব্যাকুল আশঙ্কায় তাঁর অপেক্ষা করে আছেন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁরা বৈদ্যবাটীর পথ ধরলেন।

মাঠের মাঝে কুড়িয়ে-পাওয়া সেই একটী রাত্রির সম্পর্ক। বিদায় দিতে গিয়ে ডাকাতের চোখে জল ভরে আসে।

নীরবে অনেকখানি পথ তারা দুজনে সঙ্গে সঙ্গে চলে। এবার যেতে হবে ছেড়ে।

এক বাগদিনী-মা ক্ষেত থেকে কতকগুলো কড়াইশুঁটি তুলে নিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া-মেয়ের আঁচলে বেঁধে দিল, বলে, মা সারদা, রাত্তিরবেলা মুড়ির সঙ্গে মিশিয়ে খাস্।

ডাকাতবাবা অভিমান করে বলে ওঠে, সঙ্গে এই মাগী না থাকলে তোকে মা জামাই-এর কাছে পৌঁছে দিতাম।

সারদামণি বলেন, তোমার জামাইকে আমি সব বলবো। তোমাদের কিন্তু আসা চাই-ই। কথা দাও।

বাগ্দী-দম্পতী কথা দেয়। পথ আলাদা হয়ে যায়।

"ডান দিকের রাস্তায় বাবা চলে গেল, আর আমি বাঁয়ের রাস্তা দিয়ে সোজা চল্লুম! যত দূর দেখা যায়, ফিরে ফিরে তাকায় আর কাঁদে।"*

২৬

দক্ষিণেশ্বরে নহবৎ-ঘরে এসে উঠলেন।

তখন সুরু হয়ে গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে নতুন যাত্রীদের যাওয়া আসা।

একদিন যাদের আগমন আশা করে, গঙ্গাজলে আবক্ষ দাঁড়িয়ে ঠাকুর আহ্বান পাঠিয়েছিলেন, ওরে, কোথায় তোরা, সর্বস্ব নিয়ে তোদের জন্যেই যে আছি অপেক্ষা করে, আয়, আয়, আমার পাগলী মায়ের পাগলা ছেলের দল! আজ সেই আহ্বানের সাড়া পেয়ে, একে একে তারা সব এসে জুটছে···বাংলার নব-জাগরণের প্রভাতী-চারণের দল। ঘিরে দাঁড়িয়েছে ঠাকুরকে। চলেছে তাদের মহাপ্রস্তুতি। বিশ্ব-চিত্ত-জয়ের উদ্যোগ-পর্ব।

ঠাকুরকে ঘিরে ভ্রমরের মত গুঞ্জন করে ফিরছে সদ্য-জাগা বাঙালীর স্তিমিত যৌবন।

ধ্যান-ধারণা, পূজা-পাঠ, কীর্তন আর আত্মার কর্ম! প্রত্যেককে নিজে হাতে করে গড়ে তুলছেন, আগামী দিনের মহাদায়িত্বের যোগ্য করে। নিত্য চলেছে চিত্ত ভরে অমৃত-রস-ভুঞ্জন।

---

* মার আত্মকথা

সেই মহোৎসবের একপাশে নিতান্ত নিঃশব্দে সারদামণি প্রতিদিনের নিত্যকর্মের মধ্যে নীরবে অপেক্ষা করে থাকেন, কখন আসবে তাঁর আহ্বান।

নহবতের বারান্দায় বাঁশের চটাইয়ের বেড়া। সেই বেড়ার মধ্যে একটা ছোট ছিদ্র করে নিয়ে সারদামণি আকুল অন্তরে চেয়ে চেয়ে দেখেন, আনন্দ-রসে ঠাকুর ভক্তদের নিয়ে নৃত্য করছেন।

রাত্রিতে জ্যোৎস্নায় মন্দির-প্রাঙ্গণ ভরে গিয়েছে। চারিদিক সুষুপ্ত নীরব। একা নিদ্রাহীন চোখে, "চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড়-হাতে বলেছি, তোমার ঐ জ্যোৎস্নার মতন আমার অন্তর নির্মল করে দাও।"*

'রাতে যখন চাঁদ উঠতো, গঙ্গার ভেতর স্থির জলে তার প্রতিবিম্ব দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতুম, চাঁদেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।'

২৭

বেশ ভাবের মধ্যে এক দিনের পর দিন যায়, দেখা-শোনা নেই।

এত কাছে থেকেও, শুধু চোখের দেখা, তাও হয় না এমন ভাবে কখনও দুমাসও কেটে যায়।

নীরবে তাঁর নির্দিষ্ট কাজ তিনি করে যান। এতটুকু চঞ্চলতা নেই, কোন আক্ষেপ, কোন অভিযোগ নেই। একনিষ্ঠভাবে শুধু যা যা করবার ভার পেয়েছেন তাই করে চলেন।

* মা'র আত্মকথা

শুধু একবার দেখবার জন্যে অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠলেও, মুখ ফুটে সেটুকু প্রার্থনাও কাউকে জানান না।

কঠিন গুরু, বড় কঠোর তার শিক্ষা।

হঠাৎ একদিন সুযোগ এলো। ঠাকুরের সকালবেলাকার খাবার, ঠাকুরের সাধ হলো, সারদামণি নিজে হাতে করে এনে খাইয়ে যাবেন।

সারাদিনের মধ্যে সেইটুকু শুধু দেখার সুযোগ।

কোথা থেকে এলো গোপালের মা। বলে, ঠাকুরের খাবার, আমি নিয়ে যাব। আমি দাঁড়িয়ে খাওয়াবো ঠাকুরকে।

প্রতিবাদ করেন না। বন্ধ হয়ে যায় দিনের সেই একটিবার দেখা।

নিভৃতে "মনকে বোঝাতুম, মন, তুই এমন কি পুণ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি।"*

পরিপূর্ণ প্রেম, তার আছে পরিপূর্ণ ধৈর্য।

সেই শুধু পারে অপেক্ষা করে থাকতে।

এ প্রেম, এ ধৈর্য, এ শুধু তোমারি, ওগো বাংলার মাটির মেয়ে!

ভয় হয়, এই ভাঙ্গা-গড়ার ভিড়ে, তোমাকে কি হারালাম আমরা?

২৮

নহবৎ-ঘর। তাকে কি সত্যি ঘর বলা চলে?

* মার আত্মকথা

চওড়া দশ ফিট, লম্বা বারো ফিট। ছোট্ট একটা দরজা, এত নীচু যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে ঢুকতে-বেরুতে গেলেই মাথা ঠুকে যায়।

প্রথম প্রথম সারদামণির তাই হতে লাগলো। খালি মাথা ঠুকে যায়। তারপর অভ্যাস হয়ে গেল।

সেই ঘরের মধ্যে, স্থায়ী বাসিন্দা, দু'জন। সারদামণি এবং ঠাকুরের ভাইঝি লক্ষ্মী। তার ওপর, প্রায়ই ভক্ত শিষ্যাদের মধ্যে দু'তিন জনও কোন কোন রাত্রিতে থেকে যায়। তারাও সেই ঘরে জায়গা নেয়।

তার মধ্যেই আবার রান্না-বান্না। জিনিস-পত্রের ভাঁড়ার। মাটীতে ধরে না, শিকের ওপর শিক দিয়ে সাজানো।

অন্ধকার রাত্রি থাকতে ঘুম থেকে উঠে পড়েন।

মন্দিরের লোকজন ঘুম থেকে ওঠবার আগেই, সকালের স্নান ইত্যাদি সব সেরে ফেলতে হয়।

স্নানের জন্যে গঙ্গার ঘাটে আসতে হয়।

তখনও অন্ধকার ঘাটের সিঁড়ি। প্রতিদিন যেমন সিঁড়ি বেয়ে জলে নামেন, একদিন নামতে গিয়েছেন, অমনি মনে হলো, সামনে ঘাটের ওপর কি যেন শুয়ে রয়েছে। পা তুলেছেন, দেখেন, জলাশ্রয় ত্যাগ করে বৃহৎ এক কুমীর ঘাটের ওপর রাত্রিবাস করছে।

কি ভেবে কুমীর সশব্দে দয়া করে জলের ভেতর চলে গেল।

তাড়াতাড়ি কোন রকমে মাথায় জল ঠেকিয়ে চলে এলেন।

তারপর থেকে লণ্ঠন নিয়ে যান…

ধাত্রী-শিষ্যাদের মাঝে মাঝে ঠাকুর বলতেন, ঐ ছোট্ট ঘরে একটী ভাল মেয়ে আছে, দেখে যা। আহা, ও যেন নির্বাসিতা সীতা।

ঠাকুর জানেন, উনি লাজশীলা।

ডেকে বলেন, তা কেন? পাড়ায় বেড়াতে যাবে।

দুপুরবেলা পঞ্চবটী নির্জন হলে, কালীবাড়ীর খিড়কী দরজা দিয়ে কখন কখন নিকটবর্তী প্রতিবেশিনীদের কাছে যান। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে থাকতে হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে আবার পাঁচিল দিয়ে নহবৎ-ঘরে ফিরে আসেন।

মন্দিরের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করলে, তারা বলে, শুনেছি বটে, নহবৎ-ঘরে নাকি ঠাকুরাণী থাকেন।

২৯

ক্রমশ যত দিন যায়, তত কাজ বাড়ে।

ঠাকুরের শিষ্যেরা ভেঙ্গে দেন লজ্জার বাঁধ।

দলে দলে আসে ছেলের দল মা-ডাকে ভরে ওঠে মন।

সারাদিন তাদেরই সেবার আয়োজনে আটকে পড়ে থাকতে হয় সেই ছোট্ট নহবৎ-ঘরে।

ঠাকুর ইচ্ছে করে শিষ্যদের পাঠিয়ে দেন...ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিত্য নতুন ফরমাস...পানসাজা থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটী শিষ্যের জন্যে দরকার হলো আলাদা আলাদা রকমের সব খাবার।

একরাশ পান সেজে উঠলেন, এমন সময় দেখেন ঠাকুর একরাশ পাট পাঠিয়ে দিয়েছেন, দড়ি পাকিয়ে শিকে তৈরী করতে হবে। শিকেতে শিষ্য-শিষ্যাদের জন্যে খাবার টাঙানো থাকবে।

হঠাৎ কলকাতা থেকে বিশজন লোক এসেছে। এক্ষুনি তাদের জন্যে খিচুড়ী চাই।

হাঁ, নরেন আজ এখানে খাবে, ডাল যেন পাতলা না হয়, নরেন ঘন ডাল বড় ভালবাসে।

সন্ধ্যার মুখে এলো রাখাল আর রামচন্দ্র খাবে বলে গেল, উনুন নিভোন না হয়, রাখাল আর রামের জন্যে ভাত করতে হবে।

বিরক্তি নেই, ক্লান্তি নেই, প্রতিবাদ নেই, প্রশ্ন নেই, ত্যাগে সেবারূপিণী আনন্দময়ী মা আমার।

৩০

সবার ওপর আছে, একটা শিশুর প্রতিটি না চাওয়া প্রয়োজনের তাগিদ মেটানো — ঠাকুরের সেবা।

মা যেমন ছোট ছেলের কখন কি দরকার তা বোঝেন এবং বুঝে সেইমত ব্যবস্থা করেন, তেমনি ধারা সারদামণি ঠাকুরের কখন কি দরকার তা বোঝেন এবং বুঝে সেইমত ব্যবস্থা করেন।

সদা-ভাবে-মগ্ন সেই শিশু ভোলানাথকে অপার মাতৃ-স্নেহে তিনি ঘিরে রাখেন।

কখনো শিশুর মত ভুলিয়ে খাওয়াতে হয়, কখনো কম ভাত দেখাবে বলে প্রত্যেকটি ভাত টিপে টিপে সরু করে সাজিয়ে দিতে হয়, বরাদ্দ দুধের বেশী খাওয়াতে হলে, ঘন করে তাকে সেই মাত্রায় আনতে হয়।

সেবার হঠাৎ ঠাকুর লক্ষ্য করলেন, উপরি উপরি তিনদিন তাঁর খাবার যেন অন্য কেউ রাঁধছে ! কি ব্যাপার ?

সারদামণি এসে জানালেন, এই তিনদিন অশুচি বলে তিনি তাঁর খাবার স্পর্শ করেন নি।

ঠাকুর হেসে উঠলেন, অশুচি ! কে বল্লে গা তোমাকে এসব কথা ? এই দেহে যদি ভগবানের স্থান হয়, তবে তার রক্ত, মাংস, হাড় কোন কিছুই অশুচি নয় !

৩১

আমাদের পুরাণকার শিবের তৃতীয়-নেত্র কল্পনা করেছেন।

আমরা এই ভারতবর্ষে বহুবার দেখেছি, এই মানুষ নিজের সাধনায় এই দুটো চোখ যতটুকু দেখতে পায়, এই দুটো কান যতটুকু শুনতে পায়, তার চেয়ে ঢের বেশী দেখবার, তার চেয়ে ঢের দূরের কথা শোনবার শক্তি অর্জন করেছে। এই হলো আমাদের সাধনা। বার-বার তা থেকে আমরা সরে গিয়েছি, বারবার আবার সেই দিকে মহাপুরুষেরা এসে আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

সেদিনও দক্ষিণেশ্বরে দেখেছি তার পুনঃপ্রকাশ। ইতিমধ্যেই আবার গিয়েছি ভুলে।

অপূর্ব প্রেমে সারদামণি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুরের মধ্যে।

কখন কখন সেই ছোট্ট নহবৎ-ঘরের ভেতর বসে থেকেই, তিনি দেখতে পেতেন ঠাকুরকে, শুনতে পেতেন তাঁর কথা।

তখন স্বামী ত্রিগুণাতীত সন্ন্যাস নেন্ নি। ঠাকুরের আকর্ষণে আত্মীয়-স্বজনকে লুকিয়ে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসেন। তাঁর শেয়ারের গাড়ী-ভাড়া ঠাকুরই দিয়ে দিতেন।

একদিন স্বামীজি এসে উপস্থিত হয়েছেন। ঠাকুর খুসী হয়ে বল্লেন, যা নহবৎ-ঘরে গিয়ে তোর ভাড়ার চারটে পয়সা চেয়ে নিয়ে আয়!

সারদামণি তখন নতুন ভক্তদের সামনে বেরুতেন না।

স্বামীজি নহবৎ-ঘরের দরজায় এসে দেখেন, দরজার সামনে চারটে পয়সা মা রেখে দিয়েছেন।

সেদিন বিকেলবেলা নরেন এসে উপস্থিত হয়েছেন। ঠাকুর অনুরোধ করলেন, তুই আজ যেতে পাবি না···রাত্তিরে এখানেই থাবি··

কথাবার্তার পর সন্ধ্যার মুখে গঙ্গাস্নানে যাবার সময় ঠাকুর নহবৎ-ঘরে সেই সংবাদ দিতে গিয়ে দেখেন, ছোলার ডাল চড়িয়ে মা নরেনের জন্যে ময়দা মাখছেন!

সেদিন ঠাকুরের জন্মতিথি। কলকাতা থেকে অনেক ভক্ত এসেছেন। মেয়েরাও এসেছেন।

উৎসব শেষ হতে রাত্রি হয়ে গেল।

ঠাকুর যোগীন-মা আর তাঁর সঙ্গের মেয়েদের ডেকে বল্লেন, এত রাত্তিরে তোদের আর ফিরে যেতে হবে না. কিন্তু শুবি কোথায়? তা, আমার ঘরের পাশে, ঘেরা বারান্দাটা রয়েছে; ঐখানেই শুয়ে রাত কাটিয়ে দে!

কথা সেরে যোগীন-মা নহবৎ-ঘরে মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেন, মা তাঁদের শোবার জন্যে সেই ছোট্ট ঘরটুকুর মধ্যেই বিছানা পেতে রেখেছেন !

প্রেমই দেয়, এই তৃতীয় নয়ন…শ্রবণের অতিরিক্ত শ্রবণ-শক্তি… স্পর্শের অতীত অনুভূতি।

দেহ-সম্বন্ধ এখানে অচল পয়সার মতন দেওয়া-নেওয়ার বাইরে কোথায় হারিয়ে যায়, খুঁজে দেখবারও পরিশ্রম পোষায় না।

৩২

তীব্র সন্ন্যাসের অন্তরে সুনিবিড় প্রেম…বৈরাগ্যের বাহুবন্ধনে লীলা… সত্যের মধ্যে নেই কোন বিরোধ।

আসক্তি যেখানে পুড়ে গিয়েছে, চরম বৈরাগ্য সেখানে আপনা থেকে ফুটে ওঠে পরম প্রেমে।

পরোপ পাবে না বুঝতে।

সে মানসিক অভিজ্ঞতার স্তরে এখনও পৌঁছয় নি তারা।

তাই যখন দেখি সবকামনাহীন সন্ন্যাসী আমার, ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, সারদামণি আজ অসুস্থ…মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে…ছোটছেলের মত রামলালের কাছে ছুটে গিয়ে কাতরভাবে বলছেন, কি হবে রামলাল ? ওর যে মাথা ধরেছে ?

মনে হয়, এই ব্যাকুলতাটুকু তুলে রেখে দিই, পৃথিবীর প্রথম শিশিরে ভিজিয়ে, শুকতারার ডাকে…

সেদিন সন্ধ্যার পর, ঠাকুর নিজের ঘরে চোখ বুঁজে খাটের ওপর শুয়ে আছেন। মা এসেছেন ঘরে খাবার রেখে দিয়ে যেতে। ঠাকুরকে নিমীলিত-দৃষ্টি দেখে মা খাবার রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ঠাকুরের মনে হলো, বুঝি তার ভাইঝি লক্ষ্মী এসেছে। তাই তেমনি চোখ বুঁজে বলেন, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাস।

দরজা বন্ধ করতে করতে মা জবাব দিলেন, বন্ধ করে দিয়ে গেলাম।

মার কণ্ঠস্বরে ঠাকুর চমকে খাট থেকে উঠে পড়লেন। হঠাৎ কি এক ব্যাকুল কাতরতায় তাঁর কণ্ঠস্বর ভরে এলো। তাড়াতাড়ি মার কাছে এসে একান্ত সঙ্কুচিত হয়ে বলেন, আহা তুমি! আমি ভেবেছিলাম লক্ষ্মী। বড় রুক্ষকথা মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে কিছু মনে করোনি গো।

"দিয়ে যাও' না বলে, বলেছিলেন 'দিয়ে যাস"

সহজ রুক্ষবাণীর অনুশোচনা সেদিন সারারাত ঠাকুরকে বেদনা দেয়। সারারাত ঘুমাতে পারেননি।

ভোরবেলা উঠেই নহবৎ ঘরে মার কাছে গিয়ে অনুতপ্ত অন্তরে আবার বলেন, ওগো, কেন এমন রুক্ষ কথা বলে ফেললাম?

কোন য়ুরোপীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, রামকৃষ্ণ বিবাহ করে স্ত্রীকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিতই করেছিলেন।

প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন।

সেবার কোথা থেকে অনেক ফল এসেছে। কোন ভক্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন। মা দু'হাতে বিলিয়ে দিলেন। ঠাকুর দেখলেন, তাঁর প্রিয়

শিষ্যদের জন্যে একটাও নেই। তাই বলে উঠলেন, হাঁ গা, সবগুলো দিয়ে দিলে ?

মা কিছু না বলে ম্লান অভিমানে চলে গেলেন।

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে রামলালকে পাঠালেন, ওরে, তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর, ও রাগলে সব নষ্ট হয়ে যাবে!

এই সন্ন্যাসীর কাছে প্রেম-দীক্ষা নাও, হে আমার তরুণ বাংলা।

য়ুরোপ নয়, এই তোমার উত্তরাধিকার। ন্যায্য পৈতৃক সম্পত্তি। উপযুক্ত সন্তানের মত বুঝে নাও তোমার প্রাপ্য।

৩৩

কখন ফুল ফুটে ওঠে, কেউ তার খবর জানে না। কখন ভরে ওঠে তার বুকে সৌরভ আর মধু, কেউ তা জানে না।

কোন বিজ্ঞাপন নেই সেখানে।

তেমনি নিঃশব্দে কখন কি ভাবে ভরে উঠছিল সারদামণির আত্মিকজীবন, গুরু আর শিষ্য ছাড়া, তৃতীয় কোন ব্যক্তি জানতো না দক্ষিণেশ্বরে। এমন কি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যেরাও না।

নিজেকে জাহির করার কোন চেষ্টাই তাঁর মধ্যে ছিল না। এই অপূর্ব আত্মগোপনতার শক্তি, ফুলের সৌরভের মতই ছিল তাঁর স্বভাবধর্ম।

কৌতূহলী যাত্রীরা নানাভাবে এই গোপনচারিণীর আত্ম-গোপনতার দুর্গ ভেদ করে ভেতরকার সংবাদ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতেন কিন্তু কোনমতেই তিনি ধরা দিতেন না। কায়া ঠাকুর, তিনি ছায়া, তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়?

কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে, ধীরে ধীরে এই পুস্তকজ্ঞানহীনা সামান্যা নারীর অন্তরে, তাঁর মানসিক উৎকর্ষের ফলে, এক বলিষ্ঠ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়ে উঠছিল···যে-ব্যক্তিত্বের স্নেহস্পর্শের কাছে একদিন বিবেকানন্দ-সারদানন্দের মত দিগ্বিজয়ী প্রতিভা শক্তি ও সান্ত্বনার আশায় আত্মনিবেদন করে, যে-ব্যক্তিত্বের সামনে প্রণতা হয়ে একদিন য়ুরোপের মেয়ে নিবেদিতা বলেছিলেন, এ মাট্-দেবী, আ-প-নি হন্ আ-মা-ডি-গের কা-লী!

ঠাকুর সেই অদূর ভবিষ্যতের জন্যেই সকল দিক থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলছিলেন।

জীব-চক্রে জীবনের যাত্রাপথে যাঁকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, ধীরে ধীরে ধর্মের পথে তিনি তাঁকে শিক্ষা ও দীক্ষার দ্বারা সত্যকারের সহধর্মিণীরূপেই গড়ে তোলেন। একে একে আত্মার নিগূঢ় পথের সব রহস্য তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত করেন এবং তাঁরই নির্দেশে সেই নিভৃত নীরব সাধনায় সারদামণি সিদ্ধিলাভও করেন।

কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ সেদিন কেউ দেখতে পেত না।

সংসারের শতকর্মের মধ্যে থেকেও, তিনি ধ্যানলোকে বিচরণ করতে শিখেছিলেন। তার জন্যে একদিনও তাঁকে সংসারের কোন

ডাকে সাড়া দিতে বিন্দুমাত্র দেরী করতে দেখা যায়নি। কতদিন কত বিনিদ্ররজনী ধ্যান-সমাধিতে কেটে যেত, কেউ তার সংবাদ জানতো না।

ক্বচিৎ কখন মধ্যরাত্রিতে কিম্বা নিশাশেষে কোন শিষ্য বা ভক্ত সেইদিক দিয়ে যেতে দেখতে পেতেন, নিশুতি রাত্রির অন্ধকারে সেই নিশ্চল ধ্যানী নারীমূর্তি···দূর থেকে তাঁরা প্রণাম নিবেদন করে নীরবে চলে যেতেন।

একদিন গভীর রাত্রীতে স্বামী যোগানন্দ ঠাকুরের অন্বেষণে পঞ্চবটির দিকে যাচ্ছেন, এমন সময়ে দেখেন, নহবৎ-ঘরের পশ্চিমধারের বারান্দায় দক্ষিণমুখী হয়ে মা ধ্যানে নিশ্চল বসে আছেন।

ঠাকুরের ভক্ত শিষ্যা যোগীন-মা প্রায়ই মার সঙ্গে থাকেন, ওঠেন, বসেন কিন্তু মার আত্মিক সাধনার প্রকৃত খবর তিনিও পর্যন্ত সঠিক জানতেন না। একদিন রাত্রিবেলা হঠাৎ নহবৎ-ঘরে এসে দেখেন, দরজা ভেজান। একটু খুলে দেখেন, ঘরের ভেতর মা অবিরল ধারায় কাঁদছেন। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। একটু পরেই আবার মা হাসতে আরম্ভ করলেন, ছোট বালিকার মত। সেইক্ষণে আবার কান্না। দুই চোখ দিয়ে অবিরল ধারা। তারপর হাসি নেই, কান্না নেই, কোন সাড়া নেই······নিশ্চল প্রস্তর মূর্তি······পূর্ণ সমাধিস্থ।

৩৪

শুক্লা ত্রয়োদশীতে পেনিটীর বৈষ্ণব মেলা।

ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে চলেছেন।

চারখানা পানসি ভাড়া করা হয়েছে। যাত্রী অনেক।

সারদামণিরও যাবার বিশেষ বাসনা। ঠাকুরের অনুমতির জন্যে একজন স্ত্রীভক্তকে তাঁর কাছে পাঠালেন।

ঠাকুর শুনে বল্লেন, যদি ওর ইচ্ছে হয় তো চলুক!

যিনি অনুমতি আনতে গিয়েছিলেন, তিনি উল্লসিত হয়ে মাকে জানালেন, ঠাকুর অনুমতি দিয়েছেন, চলুন!

সারদামণি জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি বল্লেন?

—বল্লেন, ওর যদি ইচ্ছা হয় তো চলুক!

হেসে সারদামণি বল্লেন, তোমরা তা হলে যাও, আমি যাব না!

বিস্মিত হয়ে শিষ্যা জিজ্ঞাসা করেন, সে কি!

মা বুঝিয়ে বলেন, তাঁর যদি অনুমতি দেবার ইচ্ছা থাকতো, তিনি তাহলে আমার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিতেন না।

ঠাকুর শুনে খুসীই হলেন; বল্লেন, দেখেছ কি রকম বুদ্ধিমতী!

কিন্তু এই বুদ্ধিকে নানাভাবে তিনি পরীক্ষা করে দেখেন।

মাড়োয়ারী ভক্ত লছমীনারায়ণ ঠাকুরের সেবায় ঠাকুরকে দেবার জন্যে দশহাজার টাকার নোট একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে উপস্থিত।

ঠাকুর যত প্রত্যাখ্যান করেন, লছমীনারায়ণ ততই চেপে ধরে। অনুরোধ, উপরোধ।

ঠাকুর নিজে কিছুতেই নেবেন না বুঝতে পেরে হঠাৎ লছমীনারায়ণ একটা প্রস্তাব করলো, তাহলে মার নামে টাকাটা লিখে দি!

ঠাকুরের মনের কোণেও এ প্রস্তাবের কোন সমর্থন ছিল না। কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি সারদামণির অন্তর পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। ওকে পাঠালেন নহবতে।

বললেন, ওগো, ওতো নাছোড়বান্দা, আমি না নিলে ওই দশহাজার টাকা তোমার নামে লিখে দিতে চাইছে, তা তুমি তবে নাও না কেন?

চমকে উঠে সারদামণি বলে উঠলেন, তা কেমন করে হবে? আমি নিলে সে টাকাটা তোমারই নেওয়া হবে। আর তাও দিতে হয়, আমি তো নিলে তোমার সেবাতেই খরচ করব। সে কি ঠিক হবে।

আনন্দে উথলে ওঠে ঠাকুরের মন। তাঁর লীলার সময়ে তিনি তার যোগ্য প্রতিনিধিকেও রেখে দিয়ে গেলেন সারদামণির মধ্যে।

৩৫

পেনেটী উৎসবে যাবার আগে থেকেই ঠাকুরের গলার রোগ দেখা দেয়। সেখানে এই উৎসবে আত্মহারা হয়ে তিনি কীর্তনে মেতে ওঠেন।

ফিরে যখন এলেন, অত্যধিক বল প্রয়োগে গলার ভেতরে তখন প্রচ্ছন্ন-রোগ প্রবল হয়ে উঠেছে।

চিকিৎসা চলতে থাকে কিন্তু উপশমের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। তখন চিকিৎসার জন্যে উৎকণ্ঠিত শিষ্যেরা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। সেখান থেকে আবার কাশীপুরে এক বাগানবাড়ী ভাড়া করে সেখানে ঠাকুরকে রেখে চিকিৎসা চলতে লাগলো।

তখনও নরেন্দ্রের মনে মেটেনি আত্মার ক্ষুধা। সহযাত্রী গুরুভাইদের নিয়ে অসুস্থ গুরুকে কেন্দ্র করে, শুরু করেন অতন্দ্রসেবা আর উৎকট যোগসাধনা।

বিদায়ের ছায়া ঘনিয়ে আসে।

বিষাদে ছেয়ে যায় শিষ্যদের অন্তর।

সেই কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের সেবার জন্যে মাকেও আনা হলো।

এক বাড়ী লোকজন···ডাক্তার, বদ্যি···পণ্ডিত···সাধু সজ্জন।

তার মধ্যে তেতলার ছাদের সিঁড়ির পাশে ছোট্ট একটা চিলে-কোটার ঘর···সেইখান থেকে আসে ঠাকুরের সব পথ্য···

সারা বাড়ীর মধ্যে একটা কল। রাত তিনটের সময় উঠে স্নান সেরে মা চলে যান সেই তেতলার চিলে কোঠায়। সারাদিন সেখানে রান্নাবান্না করে, রাত এগারোটার সময়, বাড়ী নিশুতি হলে নেমে আসেন দোতলায়। তাঁর জন্যে এক পাশে একটা ছোট্ট ঘর নির্দিষ্ট ছিল। সেখানে ঘণ্টা তিনেক কাটিয়ে আবার উঠে পড়েন রাত তিনটের সময়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার এই সময়কার কথা উল্লেখ করে মার প্রসঙ্গে বলছেন, পুরাণে বিন্দুবাসিনী মার কথা কানে শুনেছিলাম, আজ দেখলাম চোখে সেই বিন্দুবাসিনীকে···

বিশ্ব-প্রসারিণী যে শক্তি, সেই পারে হতে বিন্দুবাসিনী··

৩৬

ক্রমশ চিকিৎসকেরা হতাশ হয়ে পড়লেন। তখন মা ঠিক করলেন, তারকেশ্বরে গিয়ে দেবাদিদেবের কাছে হত্যা দেবেন।

দু'দিন নিরম্বু দেবতার দরজায় শুয়ে থাকেন।

তৃতীয় দিনের দিন শুষ্ক ক্ষীণ দেহ···কি যেন আচ্ছন্নের ঘোরে পড়ে আছেন···

হঠাৎ মনে হলো যেন একসঙ্গে অনেকগুলো সাজানো মাটীর বাসনকে আঘাত করে সশব্দে ভেঙ্গে ফেলে দিল···

সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনা সংকল্প-অতীত সমাধিলোকে প্রয়াণ করলো··

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসছে···সমাধি ভেঙ্গে গেল···

সেই চেতনার অতীত লোক থেকে কি সংবাদ আহরণ করে তিনি ফিরে এলেন, তা তিনিই জানেন ··

আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন।

সেই রাত্রিশেষের ম্লান আলোয় মন্দিরের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী কুণ্ডতে কোন রকমে শীর্ণদেহে গিয়ে উপস্থিত হলেন···কুণ্ডের জল চোখে মুখে দিয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হলেন···

প্রভাতেই আবার চলে এলেন, কাশীপুরে তেতলার সেই চিলে-কোঠায়···স্থির···ধীর···অন্তরের সমুদ্র-তরঙ্গের কোন স্পন্দন বাইরে পড়ে না ধরা···

ফিরে এসেছেন শুনে ঠাকুর ডেকে পাঠালেন। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হেসে বলে উঠলেন, কিছুই হলো না তো।

৩৭

ক্রমশ সকলেই বুঝতে পারেন, বিদায়ের দিন এগিয়ে এসেছে।

শিষ্যেরা ব্যাকুল হয়ে পড়েন।

একদিন মাকে ডেকে বল্লেন, এ কি শুধু আমারই দায়, তোমারও দায়।

মার মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মহাবিরহের আশঙ্কা।

মনে জাগে প্রশ্ন, যদি কায়াই চলে যায়, ছায়ার কি দরকার?

ঠাকুর বুঝতে পারেন।

তাই একদিন নিভৃতে ডেকে তাঁর দায়িত্ব মাকে বুঝিয়ে দিয়ে বলেন, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতন কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখবে...আমি কি করেছি, তোমাকে এর চাইতে বেশী করতে হবে

নীরবে সে সংবাদ নিয়ে তিনি স্বীকার করে নেন।

৩৮

একদিন হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে, হাত থেকে দুধের কড়া পড়ে গেল।

চুড়া বাঁধছেন শিষ্যদের জন্যে। থলাটা সব পড়ে গেল।

কাপড় শুকোচ্ছিল। তুলতে গিয়ে দেখেন, নেই, কে নিয়ে গিয়েছে চোর করে।

সেদিনই দুপুরবেলা। ঠাকুর মগ্ন হলেন মহাসমাধিতে।

শেষ হয়ে গেল লীলা।

শ্মশান ফিরবার পর হিন্দুবিধবার রীতি-অনুযায়ী মা হাতের বালা খুলতে যাচ্ছেন

হঠাৎ দেখলেন, ঠাকুর এসে তার হাত দুটো চেপে ধরলেন, বললেন,

—আমি কি কোথাও গেছি গো! এ শুধু এঘর থেকে অন্যঘরে যাওয়া।

হাতের বালা মা হাতেই রেখে দিলেন।

মা আমার চির সধবা।

বীরনারীর মত তুলে নিলেন, অসমাপ্ত দায়িত্বের ভার

এখনো অনেক কাজ আছে বাকি।

— সমাপ্ত —